জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫

সমবায়

সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা

মোঃ শরিফুল ইসলাম
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি

মোঃ আহসান কবীর
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য

মোঃ মিজানুর রহমান
যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)

মুহাম্মদ হোসেনুজ্জামান
উপনিবন্ধক (পিপি)

উম্মে মরিয়ম
উপনিবন্ধক (ইপি)

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহকারী নিবন্ধক (পিপি)

ফাহমিদা আক্তার লীমা
সম্পাদক ও সদস্য সচিব

মূল্য

২৫ টাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা

মনিরুল ইসলাম

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : +৮৮০ ২২২২-২৪৮০৫৩, ৪৮১১১৮০৫, ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.coop.gov.bd, ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

সূচিপত্র

- সমবায় ব্যবস্থার সময়োপযোগী উন্নয়ন
  ড. কিউ আর ইসলাম ৩
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান
  সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায়
  সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ
  সাইয্যেদাতুন নেছা ৭
- আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় ভাবনা
  খ. ম. রেজাউল করিম ১২
- সমবায় সমিতির সভার গুরূত্ব
  সামিয়া সুলতানা ১৭
- ঐশী করুণার তরে
  মোছাঃ নূর-ই-জান্নাত ২৩
- আপিল মামলা ব্যবস্থাপনা: সমবায়ে
  বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ পদ্ধতি
  মোঃ রবিউল ইসলাম ২৫
- বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত
  অভিঘাত মোকাবিলায় সমবায়ভিত্তিক
  টেকসই অভিযোজনের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা
  আইরিন খানম ৩০
- দোহা কর্মপরিকল্পনা: সমবায় অধিদপ্তরের
  উন্নয়ন ভাবনা
  আইনিন নাঈম ফিমা ৩৪
- গুজরাটের গোয়ালা হতে কানের মঞ্চে: ‘মন্থন’
  উপমহাদেশের সমবায় বিপ্লবের এক কালজয়ী উপাখ্যান
  উম্মে মরিয়ম ৩৯
- সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিঃ
  প্রকৃতি নির্ভর জীবিকার সফল সমবায় মডেল ৪১
- লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণ দান
  সমবায় সমিতি লিঃ : এক দশকের অভিযাত্রায়
  সাফল্যের দৃষ্টান্ত ৪৩
- সমবায় কার্যক্রম ৪৫

সমবায় ব্যবস্থার সময়োপযোগী উন্নয়ন

ড. কিউ আর ইসলাম

সমবায় উদ্যোগে সকল শ্রেণি-পেশার গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে অগ্রগতির সাথে বর্তমান সমবায় ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে একটি মিশ্র চিত্র ফুটে উঠবে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে সমবায় উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন সম্ভব হয়নি। যদিওবা দেশব্যাপী আর্থিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়েছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়বর্ধন হয়েছে এবং প্রায় সব ধরনের পণ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা, উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির সঙ্গে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসাসহ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রমঘন শিল্প খাতে অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন নতুন খাত যুক্ত হচ্ছে। আগামী দিনে কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে উৎপাদনশীলতা আরো বর্ধিত হয়ে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর সাথে বিদেশে রপ্তানির ক্রমবর্ধমানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা প্রসারিত হবে। এই সমস্ত উৎপাদনশীল খাতে যথাযথ বিনিয়োগ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করে সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় উদ্যোগের গুরুত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন, ম্যানুফাকচারিং, ব্যবসা, পরিবহন ও সেবাভিত্তিকসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগে প্রয়োজনীয় উপকরণের চাহিদা পূরণ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, বাজার অনুসন্ধান ও সংযোগ স্থাপন এবং উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা বৃদ্ধিতে সার্বিক সহায়তা, পরামর্শ ও তথ্য প্রদান সমবায় উদ্যোগকে অধিকতর সফল ও সার্থক করে তুলবে। উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে গঠিত সমবায় সমিতির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও মিথস্ক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সমবায় উদ্যোগে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ

দেশব্যাপী বাজার ব্যবস্থায় যুগপৎ পরিবর্তন এবং উৎপাদিত পণ্য বিপণন প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার ফলে বর্তমানে সমবায় উদ্যোক্তাদের সফলতা অর্জনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অন্যদিকে, প্রশাসনিক জটিলতা ও সীমিত মূলধন সমবায় উদ্যোগ গ্রহণে সদস্যদের নিরুৎসাহিত হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়। ফলে সমবায় উদ্যোগ সফল ও অধিকতর ফলপ্রসূ করে তুলতে যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। যাতে করে সমবায় সেবা ও বিনিয়োগ গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জনগোষ্ঠীর কল্যাণে অধিকতর সহায়ক ও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে। কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক সফলতা অর্জনের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখীকরণ ও প্রবৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য সকল খাতে সমবায় উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করতে বর্তমান প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে যথাযথ কার্যক্রম বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সমবায় ব্যবস্থায় জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত হওয়ার অপার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। সমবায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সেরা সমবায় পদ্ধতি অনুশীলন ও নীতি সহায়তা, সমবায় সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা ও সমবায় উদ্যোগে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সফলতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে। সমবায় সদস্য ও উদ্যোক্তাদের বিপণন আইন, বিধি ও নীতি, অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার চাহিদা ও দর, বাজারের অবস্থান, সরবরাহ বা সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পণ্য বিপণনে বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার ও কুলচেম্বার নির্মাণসহ গুদামজাতকরণ, পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, গ্রেডিং, বাছাই বা সর্টিং, মেয়াদ নির্ধারণ, প্যাকেজিং বা মোড়কীকরণ, লেবেলিং ও ই-বিপণন এর গুরুত্ব বেড়েছে। বিপণন তথ্য ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। উৎপাদককে যৌক্তিক ও লাভজনক মূল্যে পণ্য বিক্রয়ে সহায়তা, চুক্তিভিত্তিক বিপণন, প্রক্রিয়াজাত এবং পাইকারি, পরিবহন ব্যবসায়ী, রপ্তানিকারক ও ভোক্তাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পণ্য চাহিদা ও বাজার ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় সদস্য ও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তর ও সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এগিয়ে আসা সময়, চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে বিশেষ দায়িত্ব হয়ে পড়েছে।

পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সংগঠিত ও উৎসাহিত হয়ে উৎপাদনমুখী সমবায় উদ্যোগে সমবায়ীদের অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার সাথে সাথে দেশে সমৃদ্ধ সমাজ গঠন ও জাতীয় অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে সমবায় উদ্যোক্তারা বৃহত্তর অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

সমবায় ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্র

দেশের সার্বিক উন্নয়নে নির্ভরযোগ্য ও অন্যতম উপায় হিসেবে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্য নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সংগঠিত ও উৎসাহিত হয়ে উৎপাদনমুখী সমবায় উদ্যোগে সমবায়ীদের অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি ও জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষার সাথে সাথে দেশে সমৃদ্ধ সমাজ গঠন ও জাতীয় অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নে সমবায় উদ্যোক্তারা বৃহত্তর অবদান রাখতে সক্ষম হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমবায় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদান এবং বীমা সহ বিভিন্ন সেবা, কল্যাণমুখী ও জনহিতকর উদ্যোগ গ্রহণের উপর বিশেষ জোর দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমবায় আইন ও বিধিমালা এবং সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠন পরিচালনা ও

ব্যবস্থাপনা, যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমবায় কর্মকাণ্ডে প্রান্তিক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি, যথাযথ নিয়মকানুন মেনে স্থানীয় সমর্থনে কার্যক্রম পরিচালনা এবং সদস্যভুক্তি ব্যতীত সমবায় পরিষেবা গ্রহণে বিধিনিষেধ থাকা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে। সমবায় উদ্যোগ সার্থক করে তুলতে তহবিলের অপব্যবহার, অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি অথবা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থে তহবিল ব্যবহার কিংবা আত্মসাৎ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এ ছাড়া পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব সমবায় উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিতে পারে। দক্ষতা, দূরদর্শিতা, সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আন্তরিকতার অভাব, অব্যস্থাপনা, কোন্দল এবং ক্ষমতার দাপট সমবায় উদ্যোগকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে দক্ষতার সাথে প্রতিকার এবং সমবায় উদ্যোগে সফলতা অর্জনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত হতে ও এগিয়ে যেতে বর্তমান সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং যুগোপযোগী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

বর্তমান সমবায় ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও গবেষণা এবং সময়োপযোগী পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সুযোগমতো যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হলে উৎপাদনমুখী সমবায় উদ্যোগের সফলতা বৃদ্ধি পাবে। সমবায় উদ্যোগে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিজাত পণ্য, বনজ সম্পদ ও শিল্প উৎপাদন ও বিপণন বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের দেশে নিম্ন আয়ের কর্মজীবীদের সংগঠিত করে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিজাত পণ্য, বনজ সম্পদ ও গ্রামীণ শিল্প উৎপাদনে দক্ষতা উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিক মূল্যে সরবরাহ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং উদ্যোক্তা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে স্থানীয় আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক বা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গঠিত হলে সাধারণ সদস্যরা স্থানীয় আর্থসামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম নাও হতে পারে। পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, মূলধন গঠন, বিনিয়োগ, আয়বর্ধক ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদিত পণ্য বিপণনে ও বাজার সংযোগ স্থাপনে জোর দিতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নে গ্রামীণ এলাকায় অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। সেইসাথে গ্রাম ছেড়ে জীবিকার খোঁজে শহরগামী পরিযায়ী শ্রমিকদের নিজ এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সমবায়ীদের যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়। উৎপাদিত পণ্যের বৈশিষ্ট্য ও সমবায়ীদের মতামতের ভিত্তিতে বিপণন সুবিধা তৈরি ও যৌক্তিক ও লাভজনক মূল্যে বাজারজাতকরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত সুবিধার জন্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকারী, পাইকারি, হিমাগার, রপ্তানিকারক ও ভোক্তার সাথে সংযোগ তৈরি সহজ হয়। সমবায় সমিতি উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সাপ্লাই চেইনে প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে সমর্থ হয়। নিজস্ব প্যাকিং ও লেভেলিং ব্যবস্থা, হিমাগার, সংরক্ষণাগার, প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র এবং মাননিয়ন্ত্রণ, অনলাইন যোগাযোগ ও হিসাব ব্যবস্থার উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। সমবায় উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সময় উপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক উন্নত ও টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন ও পরিদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ থাকতে হবে। এর ফলে সদস্যরা দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার সক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সমবায় উদ্যোগ গ্রহণে তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। সমবায় সমিতির সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এগিয়ে এসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কৌশল হস্তান্তর ও প্রয়োগে সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম। উৎপাদন প্রযুক্তি ও কৌশলের উপযোগিতা, ফলাফল ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়েও সমবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এতে করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমবায় সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হওয়ায় স্থানীয় উপযোগী উৎপাদন প্রযুক্তি ও কৌশল উদ্ভাবন সহায়ক হয়। উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারে সুদক্ষতা অর্জনে ভূমি ও পানিসহ স্থানীয় সম্পদ ও শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে সমবায় উদ্যোগে বিনিয়োগ অধিকতর লাভজনক হয়ে ওঠে। নতুন উৎপাদন ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ হয়। সমবায় সদস্যরা টেকসই উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা

বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উন্মুক্ত ও বিকাশমান বাজার অর্থনীতি, ভোক্তাদের জীবনমান ও চাহিদার পরিবর্তন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান সমবায় আইন, বিধিমালা ও নীতি অধিকতর উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সমবায় আইন, বিধিমালা ও নীতি

সমবায়ী বান্ধব করে তুলতে সমবায় অধিদপ্তরের বিশেষ উদ্যোগ থাকতে হবে। সমবায়ীদের কাছে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্য হবে সংগঠন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে সমবায় সমিতিকে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা প্রদান। সমবায় অধিদপ্তর আইন প্রয়োগে অবিচল থেকে সহায়ক ও সঞ্চালক হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। সমবায় কার্যক্রম পুরোপুরি আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন এবং সম্পূর্ণ দুর্নীতি মুক্ত রাখতে সমবায় অধিদপ্তরের সক্রিয় ভূমিকা থাকতে হবে। উল্লেখ্য, সমবায় অধিদপ্তরের সহযোগিতা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অভাবে সমবায় নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়তে পারে। সেই সাথে কারও স্বার্থে গঠিত কোনো সমিতি যেন সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হয়ে সদস্যদের প্রতারিত না করতে পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। সমবায় অধিদপ্তর বা সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি যেন কোনোভাবেই কোনো সংগঠনের ব্যর্থতা কিংবা বিপর্যস্ততার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। সমবায় সমিতির ব্যর্থতা ও অকার্যকর হয়ে পড়ার সম্ভাব্য কারণসমূহ সম্পর্কে সদস্যদের আগে থেকে সতর্ক করে তুলতে হবে। সমবায় উদ্যোগে কৃতকার্য হওয়ার জন্য সমবায় সংগঠনে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য । সমবায় চিন্তাভাবনা ও উদ্যোগের অভাব থাকলে বা মনোভাবের পরিবর্তন না হলে সদস্যভুক্তি হতে নিবৃত্ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন হতে পারে। নারী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী এবং ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা, উৎপাদনমুখী খাতে সমবায়ী উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত ও বাজার সংযোগ তৈরি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে।

সমিতি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংগঠক, সঞ্চালক, উৎসাহদাতা ও পরিবর্তক হিসেবে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু থেকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে । সমিতির কর্মকাণ্ডে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকল সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন, ম্যানুফ্যাকচারিং, দক্ষতা উন্নয়ন, সেচ পানি ব্যবস্থাপনা, বন্যা প্রতিরোধ, ঋণ সরবরাহ, পরিবহন, বাজারজাত ইত্যাদিতে সেবা, পরামর্শ ও সহায়তাকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনে সমবায় সমিতিকে সদা তৎপর থেকে অধিকতর জোরালো ভূমিকা রাখার যোগ্যতা অর্জনে সমবায় অধিদপ্তরকে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যথাযথ সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। সমবায় সমিতিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত সংগঠন হিসেবে অগ্রসরের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং সৃজনশীল, উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধনমূলক উদ্যোগে সফলতা অর্জনে সমবায় অধিদপ্তরকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সহায়তা করতে হবে। সমবায় উদ্যোগে সফল হতে সুশাসনের বিকল্প নেই। সেই সাথে উদ্যোগের উদ্দেশ্য, বিনিয়োগের লক্ষ্য, প্রত্যাশিত আর্থিক লাভ ও সুবিধা সম্পর্কে সদস্যদের স্পষ্ট ধারণাসহ সবাইকে একাত্ম ও অনুপ্রাণিত হয়ে উৎসাহ ও সতর্কতার সাথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। উৎপাদিত পণ্যের সম্ভাব্য বাজার নিশ্চিত হয়ে সদস্যদের মতামত পর্যালোচনান্তে বাজারজাত পরিকল্পনা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। মূলধন সংগ্রহের জন্য চাহিদা ও সর্বোত্তম উৎস নিরূপণ করতে হয়। লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট থেকে যথাযথ সমর্থন ও পরামর্শ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয়। উদ্যোগে অগ্রগতির সাথে সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়মিত পর্যালোচনা করার সুযোগ রাখতে হয়। অন্যদিকে, সমবায় উদ্যোগের ব্যর্থতার লক্ষণ শুরুতেই দেখা দেয়। যেমন, সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত প্রণোদনা প্রদানে অকৃতকার্যতা, তাদের সাথে যোগাযোগের ঘাটতি, সদস্যপদে আবেদন ও সদস্যভুক্তি সীমিত রাখা, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া, দায়িত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য সদস্য নিয়োগ, বাজার নির্ধারণ না করা, পরবর্তীতে দায়িত্ব হস্তান্তর নিয়ে পরিকল্পনা না থাকা, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, আগ্রহ ও অনুপ্রেরণার অভাব, একতা ও সহযোগিতার ঘাটতি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও আস্থার অভাব, আইনি জটিলতা ও অন্যান্য। তবে সতর্ক থাকলে উদ্যমের সাথে সংশোধনের পর পুনঃসংগঠিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত ও সফল হতে বেশি সময় লাগে না। এ সমস্ত ব্যাপারে সমবায় সমিতিকে সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে সমবায় অধিদপ্তরের পরামর্শ ও সার্বক্ষণিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর আলোকে বর্তমান সমবায় ব্যবস্থার পর্যালোচনা ও গবেষণা এবং সময়োপযোগী পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সুযোগমতো যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হলে উৎপাদনমুখী সমবায় উদ্যোগের সফলতা বৃদ্ধি পাবে। সমবায় উদ্যোগে কৃষি, মৎস্য, প্রাণিজাত পণ্য, বনজ সম্পদ ও শিল্প উৎপাদন ও বিপণন বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে। সমবায় ব্যবস্থায় সামগ্রিক উন্নয়নে সমবায় সমিতিগুলো ব্যাপকভাবে সফলতা অর্জন করতে সমর্থ্য হবে। দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে প্রান্তিক ও গ্রামীণ পরিবারের সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন সমবায় উদ্যোগে শরীক হয়ে সমবায় মূল্যবোধের শক্তিশালী ঐতিহ্য হয়ে উঠে দেশের উৎপাদনমুখী অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে বৃহত্তর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে।

ড. কিউ আর ইসলাম (কাজী রেজাউল ইসলাম)
কৃষি, পানি সম্পদ ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ
এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বাস্তবায়িত প্রকল্প পরামর্শক।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিকে শক্তিশালীকরণে ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণ

সাইয়্যেদাতুন নেছা

বাংলাদেশের জনসাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণের প্রধান উৎস মাছ এবং মৎস্য সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় উৎপাদনে এ খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৫ ভাগ। দেশের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। মৎস্য খাতে জড়িত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক মৎস্য সংরক্ষণাগার ব্যবস্থাপনা,

মৎস্যজীবী এবং ভোক্তা উভয়ের স্বার্থ সমন্বয় করে ন্যায়সংগত বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে

দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে গঠিত হয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সরকারি উন্মুক্ত জলাশয় এ সকল সমিতির নামে ইজারা দেয়ার মাধ্যমে তাদের জীবিকা উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্যজীবীদের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যার আওতায় কার্যকরী মূলধনসহ বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং জেলা সমবায় কার্যালয়সমূহের আয়োজনে আইজিএ এবং উপজেলা সমবায় কার্যালয়সমূহের আয়োজনে মৎস্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাধ্যমে আধুনিক মৎস্য চাষের উপর সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় এই তিন স্তরবিশিষ্ট। তন্মধ্যে জাতীয় সমবায় সমিতি ১টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৩টি ও প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৯,৭৪৮টি। এর সর্বমোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৮৪,৯২৭ জন। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি মৎস্যজীবীদের একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, যেখানে তারা মৎস্য আহরণ ও অপেক্ষাকৃত বেশি মুনাফা লাভের জন্য সম্পদ লগ্নি করে। মাছ ক্রয় ও বিক্রয় বা মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে ঋণ সরবরাহ এ সংগঠনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। জাপান, নরওয়ে ও অন্যান্য দেশের মৎস্যজীবীরা সফল সমবায়ের আওতাভুক্ত, সেসব দেশে ঋণ-সুবিধা, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাদি সমবায় ব্যবস্থাপনায় হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এই ব্যবসা অধিকাংশ মৎস্যজীবী মধ্যস্বত্বভোগী অর্থাৎ মহাজন দ্বারা শোষিত হয়। মধ্যস্বত্বভোগীরা মৎস্যজীবীদের নগদ টাকা দাদন দেয় বলে কখনও তারা মহাজনদের কবল থেকে রেহাই পায় না। ফলে দেশে সামগ্রিকভাবে মৎস্য উৎপাদনে অভাবনীয় উন্নতি হলেও মৎস্য সমবায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, অমৎস্যজীবীদের অনুপ্রবেশ, জলাভূমির হ্রাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় প্রশাসনের অসহযোগিতা ইত্যাদি কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এ সকল সমিতির সদস্যগণ প্রত্যাশিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং সমিতিগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ছে। ফলে একদিকে যেমন প্রান্তিক মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবীগণের আর্থসামাজিক অবস্থার আনুপাতিক উন্নয়ন হয়নি তেমনি ভোক্তাগণও ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত মৎস্য প্রাপ্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে প্রায় দশ হাজার নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে অনেক সমিতি অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে এবং অধিকাংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কোনো কার্যক্রম দৃশ্যমান নয়। এসকল সমিতির অকার্যকর হওয়ার কারণ ও প্রতিকার অনুসন্ধানসহ মৎস্যজীবীদের টেকসই উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণপূর্বক এ সকল সমবায় সমিতিগুলোকে শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণের জন্য একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

সে পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তর হতে একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় :

ক. মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ;

খ. মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহ অকার্যকর হওয়ার কারণ খুঁজে বের করা;

গ. অকার্যকর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিসমূহকে কিভাবে কার্যকর করা যায় তার উপায় নির্ধারণ;

ঘ. মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক পদ্ধতিসমূহ বিশ্লেষণ ও সুপারিশ;

ঙ. মধ্যস্বত্বভোগীদের এড়িয়ে মৎস্য সহজলভ্যভাবে আহরণ ও বাজারজাতকরণে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপণ;

চ. মৎস্যজীবীদের টেকসই উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ।

যেহেতু এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ এবং সমিতির সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ সেহেতু এই গবেষণাটি করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের (Purposive Sampling) মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়েছে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর বৈশিষ্ট্য অনেকক্ষেত্রে এক হলেও এলাকাভিত্তিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবস্থানগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণাটিতে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের যেসকল জেলায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি রয়েছে সে সকল সমিতি হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ৩% হারে ৩০০টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ৯০৯ জন উত্তরদাতা নির্বাচনপূর্বক নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এদের মধ্যে ৫৯৪ জন সমবায় সমিতির সাধারণ সদস্য এবং ৩১৫ জন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক।

তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুযায়ী প্রতিটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্যের জন্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য আধা-কাঠামোগত প্রশ্নপত্র, দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য প্রশ্নপত্র Key Informant Interview (KII), মৎস্যজীবী/ মৎস্যচাষী সমবায়ী, মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তা, সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে Focus Group Discussion (FGD) এর আয়োজন করা হয়। এছাড়াও মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের উপর সমবায় অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করে মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ মন্তব্য

নির্ধারিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য এবং গবেষণা দল কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, FGD (Focus Group Discussion), গবেষণা কর্মশালা ও সেকেন্ডারি উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনাপূর্বক পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ :

- গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবীদের অধিকাংশেরই বয়স ১৮ থেকে ৬৫ এর মধ্যে এবং অধিকাংশই স্বল্প শিক্ষিত। সমবায়ী মৎস্যজীবী পরিবারগুলো একক উপার্জনকারীর উপর নির্ভরশীল। মৎস্য আহরণই এদের প্রধান পেশা। তবে অনেকেই এ পেশার পাশাপাশি কৃষিকাজেও সম্পৃক্ত রয়েছেন। অধিকাংশ মৎস্যজীবী ১০ বছরের অধিককাল ধরে এ পেশায় সম্পৃক্ত রয়েছেন যাদের মাথাপিছু মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার নিচে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় মৎস্যজীবীগণের বড় অংশ পেশাটির সাথে সম্পৃক্ত থেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এটি এ সম্প্রদায়ের পেশার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন।
- সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ যে সমবায় সমিতির সদস্য তার সাংগঠনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় অধিকাংশ সমিতিতে নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে যাদের বড় অংশই নিয়মিত মাসিক সভা করে থাকে। এ সকল সমিতির স্থাবর সম্পত্তি নাই বললেই চলে। যদিও কিছু কিছু সমিতি বছর শেষে মুনাফা অর্জন করে বলে তথ্য রয়েছে, তবে অধিকাংশ সমিতিরই সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পাদিত হয় না। সমবায় সমিতিগুলোর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থাকলেও সমবায় অধিদপ্তরের সাথে তেমন কোনো সম্পর্ক বা যোগাযোগ নেই।
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর কাছ থেকে এ সদস্যরা বিভিন্ন রকমের সহয়তা পেয়ে থাকেন বলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ জানিয়েছেন। সমিতির সদস্যগণ তাদের সমিতি হতে ঋণ, প্রশিক্ষণ, উপকরণ ইত্যাদি বাবদ সহায়তা আশা করে থাকেন। সমিতিগুলো মূলত তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও মৎস্য উপকরণে সহায়তা প্রদান করে থাকে। তবে এ সংখ্যা খুব বেশি নয়- অর্ধেকের কিছু বেশি মাত্র। বাদবাকি সমিতিগুলো তেমন কোনো সহায়তা প্রদান করে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।
- বাংলাদেশের মৎস্যজীবীদের সমর্থন প্রদানের জন্য সরকার সময়ে সময়ে নীতিমালা প্রকাশ করে থাকে। পাশাপাশি সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এ সকল নীতিমালা বা কর্মসূচির সুফল পাওয়ার জন্য সরকার প্রদত্ত মৎস্যজীবী কার্ডধারী হতে হবে। তথ্য প্রদানকারী অধিকাংশ সমবায়ী মৎস্যজীবী কার্ডধারী হলেও উল্লেখযোগ্য অংশ এখনো মৎস্যজীবী কার্ড পায়নি। যে কারণে মৎস্যজীবী হিসেবে সন্তোষজনক সাফল্য অর্জনে সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ ব্যর্থ হচ্ছেন। মৎস্যকার্ড না থাকায় অধিকাংশ

সমবায়ী মৎস্যজীবী কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বিশেষ করে জলমহাল ইজারা গ্রহণ ও মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন সরকারি সহায়তা প্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন। এ ছাড়াও মৎস্যজীবী হিসেবে বিভিন্ন দপ্তরের সেবা গ্রহণেও বেগ পেতে হয়। এ সকল কারণে সহায়তা বা সেবা প্রাপ্তি সহজ করার জন্য অধিকাংশ সমবায়ী মৎস্যজীবী মৎস্যকার্ড প্রদানকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

- মৎস্য আহরণের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনে যারা নিয়োজিত রয়েছেন তাদের উৎপাদন খরচের তুলনায় মুনাফা আশানুরূপ নয়। এছাড়া আহরিত মৎস্য হতেও কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জিত হয় না। মৎস্য আহরণের উৎসগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাড়া বা ইজারায় পাওয়া, যা মুনাফা আশানুরূপ না হওয়ার মূল কারণ। এছাড়া বাজারজাতকরণ সমস্যা, পরিবহন সমস্যা, উৎপাদন সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার অভাবও কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন না হওয়ার জন্য দায়ী।
- মৎস্য আহরণে উৎসের মালিকানা মৎস্যজীবীদের শোভন কর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে এ সকল উৎসের অধিকাংশই ইজারা ভাড়ায় প্রাপ্ত, কিছু অংশ সমিতির মালিকানায় থাকলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। সমিতির সাংগঠনিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ সমিতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং সমিতির মাধ্যমে সহায়তা গ্রহণে আশাবাদী থাকেন। এ কারণে মৎস্য আহরণে উৎসগুলো প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পরিচালনায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকা মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীদের জন্য লাভজনক।
- মৎস্য বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী সম্পদ। কাঙ্ক্ষিত মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে সঠিক উৎপাদন কৌশল প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। তাই মৎস্য উৎপাদন বা মৎস্যচাষ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অধিকাংশ মৎস্যজীবী এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। সমবায় অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। যে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য তা পর্যাপ্ত নয়, আরো আধুনিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন। সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরের সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এতদসংশ্লিষ্ট গবেষক বা শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।
- বিশ্বব্যাপী অভাবনীয় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে যে প্রয়াসের ফলাফল জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব। গবেষণায় প্রাপ্ত মতামতে দেখা যায় সমবায়ী মৎস্যজীবীগণ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়। পরিবেশ ও মান সম্মত মৎস্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। মৎস্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জের কারণে উদ্যোগগুলো সার্থক হয়নি। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন।
- প্রাকৃতিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে জলমহালগুলোর ভূমিকা সর্বাধিক। জলমহালগুলোর ইজারা গ্রহণের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অগ্রাধিকার থাকলেও মৎস্যজীবী কার্ড এর অপ্রাপ্যতা, মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য, প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি কারণে প্রকৃত মৎস্যজীবী ইজারা প্রথার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জলমহাল ইজারা প্রথায় সরকারি নীতিমালা থাকলেও বাস্তবিক অর্থে এর প্রয়োগ সঠিকভাবে করা যাচ্ছে না।
- মৎস্য বিপণনে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে বাজারজাতকরণের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমবায়ী মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীগণ সঠিকভাবে সঠিক সময়ে নিরাপদে তাদের আহরিত মৎস্য বাজারজাত করতে সক্ষম হন না। প্রথমত এজন্যে দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংরক্ষণাগার নেই। কোন সময়ে কোন বাজারে তাদের উৎপাদিত মৎস্য বিপণনের জন্য প্রেরণ করা উচিত সে সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব লাভজনক বাজারজাতকরণের বড় বাধা। এছাড়া মৎস্যের মতো পচনশীল পণ্যের পরিবহনে কোনো সহনশীল নিরাপদ ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশক্ষেত্রেই স্থানীয় বাজারে স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট মাছ বিক্রয় করতে মৎস্যজীবী বা মৎস্যচাষীগণ বাধ্য হন। ফলে তার ন্যায্যমূল্য লাভে বঞ্চিত হন। যেহেতু সংরক্ষণাগার, উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল তাই এ সকল ব্যবস্থা সমবায়ের মাধ্যমে গ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
- ইজারা, মৎস্য উপকরণ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, তথ্য ইত্যাদি উপাদানের সুফল গ্রহণ করার জন্য বিনিয়োগ প্রয়োজন। সমবায় সমিতিগুলোর পক্ষে যা সম্ভব হয় না। অনেক বড় ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হলেও এ খাতে বিনিয়োগের সামর্থ্য সমাবায় সমিতি বা এর সদস্যদের নেই। বাধ্য হয়ে অন্যের দারস্থ হতে হয় অর্থের জন্য। অথবা মধ্যস্বত্বভোগীরা নিরীহ মৎস্যজীবীদের ব্যবহার করে এ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে। যার পরিণামে মৎস্যজীবীগণ তাদের প্রধান জীবিকা হতে প্রয়োজনীয় উপার্জন করতে সক্ষম হন না। জীবন জীবিকার জন্য ভালোবেসে একটি পেশাকে আঁকড়ে ধরে রাখলেও এখাতে প্রচুর আর্থিক লেনদেন হওয়া সত্ত্বেও দিনশেষে মৎস্যজীবীগণের জীবনযাত্রার মানের তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটে না। দেশের অন্যতম অর্থকরী সম্পদের উৎপাদনে নিয়োজিত এ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য তাদের কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ সর্বাগ্রে তাদেরই

দিতে হবে। মৎস্যজীবীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে যেকোনো ব্যাংক অথবা সমবায় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর এ বিষয়ে ভূমিকা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোকে সাংগঠনিক ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী করা হলে সমিতিগুলো সমবায়ী মৎস্যজীবী সদস্যদের সহায়ক ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রকাশ করতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠনের ভূমিকা পালন করতে পারে। এ বিষয়ে সরকারের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মৎস্যজীবী সমাবায় সমিতিকে শক্তিশালী করা যেতে পারে।
- সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে মৎস্য উৎপাদনে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য উদ্বৃত্ত হচ্ছে প্রচুর। ফলে মাছের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মৎস্য প্রক্রিয়াজাত করে বিপণনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে মতামত পাওয়া গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংশ্লিষ্টতায় এ শিল্প গড়ে উঠতে পারে।
- দেশের বাইরে বাংলাদেশের মাছের চাহিদা রয়েছে। কাজেই মৎস্য রপ্তানির বৃহৎ সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলোর মৎস্য রপ্তানিতে সম্পৃক্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও পুঁজির সরবরাহ করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও শীর্ষ সমবায় প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
- মৎস্য অধিদপ্তর এর সহযোগিতায় অথবা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত বা একক প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রকল্পের অধীনে প্রকল্প এলাকায় চাহিদামতো পোনা উৎপাদনের হ্যাচিং প্লান্ট, ফিড মিল ফ্যাক্টরি, বরফকল, কোল্ড স্টোরেজ, ফিস প্রসেসিং ফ্যাক্টরি স্থাপন; প্রকল্পভুক্ত মৎস্যচাষীদের উৎপাদিত মৎস্যের বাজারজাতকরণের জন্য প্রশাসনের সহযোগিতায় সমবায় মৎস্য বাজার স্থাপন করা; প্রকল্পভুক্ত মৎস্যচাষীদের উৎপাদিত মৎস্যের ব্র্যান্ডিংকরণ, অনলাইনে প্লাটফর্ম সৃষ্টি ও কনজ্যুমার সার্ভিস প্রদানের বিষয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীগণের কাছ থেকে সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে।

এছাড়াও সকল ধরনের সরকারি জলাধার বরাদ্দ প্রদানে সমবায় অধিদপ্তর/ জেলা সমবায় কর্মকর্তার সরেজমিন যাচাই ও সুপারিশ/প্রত্যয়ন আবশ্যিক করা; জেলা/ উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় নির্ধারিত স্থানে নিয়মিতভাবে 'সমবায়-মৎস্য বাজার' পরিচালনা;সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় মৎস্য/মৎস্যজাত পণ্যের অনলাইন বাজার প্রতিষ্ঠা; সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality control) নিশ্চিতকরণ এবং ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট; কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির আওতায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বরফকল/সংরক্ষণাগার/ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন/পরিচালনা; মৎস্যজীবী সমবায়ীদের জন্য তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ এবং উৎপাদন, বাজার, আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্যের জন্য কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা করার বিষয়ে মতামত পাওয়া গিয়েছে যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায়ভিত্তিক মৎস্যখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায় দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি দূরীকরণে মৎস্য খাতের উন্নয়ন নিতান্তই অপরিহার্য। বাংলাদেশ সরকার এ খাতের উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। এ ধারাবাহিকতায় গবেষণায় প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কর্মসূচি, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হলে মৎস্যজীবী/মৎস্যচাষী সমবায়ীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলো দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

সাইয়্যেদাতুন নেছা
যুগ্মনিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় ভাবনা

খ. ম. রেজাউল করিম

ইতিহাস পর্যালোচনায় প্রমাণ মেলে, মানুষ সর্বদাই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করেছে। কেননা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন ছাড়া মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ প্রসঙ্গে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন, 'মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। যে মানুষ সমাজে বাস করে না সে হয় দেবতা, না হয় পশু' (অধিকারী, ১৯৯৫: ৩৫)। আবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-'মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা-মানুষ কখনোই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই

সে নিজেকে ষোলো-আনা পেয়ে থাকে' (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২০১০: ২২৬)। সুতরাং সমাজ গড়ে ওঠার পিছনে অন্যতম ভূমিকা পালন করে মানুষের মধ্যকার সহযোগিতা। আর এই পারস্পরিক সহযোগিতার ফসল হলো সমবায়। সমবায় হচ্ছে এমন এক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সমতার ভিত্তিতে কিছু মানুষ সংঘবদ্ধ হয়। বর্তমানে এটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের স্বীকৃতি পেয়েছে। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি মানব জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে সমবায় সংগঠন গড়ে ওঠেনি।

জানা যায় ঊনিশ শতকে ইংল্যান্ডে সমবায় আন্দোলনের শুরু এবং এই শতকের শেষের দশকে বাংলা অঞ্চলে তা চালু হয়। সর্বপ্রথম কিছু ব্রিটিশ সিভিলিয়ান তাদের কর্মস্থল জেলাগুলোতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা হলেন আখতার হামিদ খান। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং কৃষিনির্ভর দেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বণ্টন, বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় ভাবনা কি? তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

সমবায় কী

সমবায়ের মূলনীতি হলো 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে (কামিনী রায়)।' সাধারণ অর্থে যখন কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে একই উদ্দেশ্যে নিজেদের কল্যাণের নিমিত্তে একটি সংস্থার আওতায় সংগঠিত হয়ে নিবন্ধন লাভ করে তখন তাকে সমবায় বলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদ কালভার্টের বলেন, কিছু সংখ্যক লোক যখন কোনো অর্থনৈতিক স্বার্থ সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হয়, তখন তাকে সমবায় বলা হয়। অর্থাৎ সমবায়ের কেন্দ্রীয় চেতনা হলো সম্মিলিত প্রয়াস। সমবায় গড়ে ওঠে কতিপয় মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। যেমন, সহযোগিতার মনোভাব, একতা, সাম্যতা, সততা, নৈকট্য, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, মিতব্যয়িতা, ঐক্যমত্যতা, স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা, বিশ্বস্ততা, সম্প্রীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি। তবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও সমাজে কল্যাণ সাধনই এর মূলমন্ত্র। এদিকে আখতার হামিদ খানের মতে, সমবায়ের সফলতার জন্য তিনটি বিষয় জরুরি। যথা- প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং কেবল প্রশিক্ষণ।

সমবায় আন্দোলনের পটভূমি

সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। জানা যায় সর্বপ্রথম সমবায় আন্দোলন শুরু হয় জার্মানিতে। এরপর সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমবায় প্রবর্তিত হয়। ঊনিশ শতকে রবার্ট গুইন সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এতে ব্রিটেনে বিপুল সাড়া জাগে এবং ১৯৪৪ সালের ১৪ আগস্ট 'রচডেল অগ্রণীদের সমতাবাদী সমবায় সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে স্ক্যান্ডেনেভীয় দেশগুলোতে সমবায় ব্যবস্থা বেশ সাফল্য অর্জন করে (বাংলা বিশ্বকোষ, ১৯৭৬: ৫৩৪)। জানা যায় শিল্প বিপ্লবের পর জার্মানি ও ব্রিটেনে সমবায়ের জয়যাত্রা আলোড়ন সৃষ্টি করে। এফ. ডব্লিউ রাইফিজেনের নেতৃত্বে জার্মানিতে মূলত কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় আন্দোলন শুরু হয়। সেখানকার প্রান্তিক কৃষকরা মহাজনদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য সংগঠিত হয়ে প্রধানত 'ঋণ দাদন সমবায় সমিতি' গঠন করে। এরূপ সমিতি প্রথম গঠিত হয় ১৮৬২ সালে। অপরদিকে, শিল্পবিপ্লবের পর ব্রিটেনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও দরিদ্র শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে সমবায় আন্দোলন শুরু করে। এক্ষেত্রে রচডেলের তাঁতি সম্প্রদায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি কৃষকরাও ক্রমশ সংগঠিত হতে থাকে। এমন এক পর্যায়ে উপমহাদেশের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে 'সমবায় ঋণ দাদন কমিটি আইন' এবং 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ অ্যাক্ট' পাশ করে বাংলার গভর্নমেন্ট সমবায়ী উদ্যোগ গ্রহণ করে (ইসলাম, ২০০৩: ৩৭)। এর মূলে ছিল কৃষি ও কৃষকদের বহুবিধ সমস্যা, যেমন: কৃষিঋণের অভাব, মহাজনী ঋণের চক্রবৃদ্ধি সুদের দরুন নিঃস্বতা এবং মান্ধাতা আমলের অলাভজনক কৃষি পদ্ধতিতে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য। ফলে সমবায় আন্দোলন জনপ্রিয়তা পায় এবং সমবায় সমিতির সংখ্যার প্রবৃদ্ধি ঘটে। হিসেব অনুযায়ী ১৯০৬-০৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ২,০০০টি এবং ১৯২০-২১ সালে এ সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৮,৩৩৭টি। ১৯২৫-২৬ সালে এসে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৬৬,০০০-এ উন্নীত হয় (বিশ্বাস, ২০০৯: ১৫)। তবে ১৯২৮ সাল নাগাদ ১১৩টি সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকসহ এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১৯,৭৪২। এরপরের বছরেই (১৯২৯ সালে) ধস নামে। বাংলাও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পতিত হয়। প্রায় সব কয়টি কো-অপারেটিভ সোসাইটিই বড় ধরনের ঘাটতির শিকার হয় এবং ব্যবস্থাপনা সংকটে পড়ে। ফলে ঋণগ্রহীতারা পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে তাদের গচ্ছিত টাকা তুলে নেয়। তদুপরি 'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট ১৯৩৫' এই আন্দোলনে আরেকটি আঘাত হানে। কো-অপারেটিভ আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ১৯৪৮ সালে একটি শীর্ষ কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ১,৪১,০০০টি। এর মধ্যে দেশ বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গে সমিতির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩১,৬৭১টি, যার সদস্য ছিল ১২,৮১,৪৩৯ জন। সদস্য প্রতি গড় শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০০ টাকা। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে সংগঠিত এসব সমিতির সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ। দেশের এক কোটির অধিক মানুষ এ সকল সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করে সমবায় আন্দোলনকে জোরদার

করেছে।

তৎকালীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার গ্রাম বাংলার উন্নয়ন কৌশল হিসেবে সমবায়কে গ্রহণ করলেও নানাবিধ কারণে তা প্রত্যাশিত সফলতা পায়নি। এসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৭) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা (১৯২৯-৩৩), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), ভারত বিভাগ (১৯৪৭) ও তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে গঠিত কমিটি (যথা- ম্যাকলাগান কমিটি, ঋণ তদন্ত কমিশন) সমবায়ের সাথে জড়িতদের অসততা ও সমবায় শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণ উল্লেখ করেন। তদুপরি এ সময় পল্লী উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারিভাবে কিছু কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়। তন্মধ্যে পল্লী পুনর্গঠন কর্মসূচি (১৯৩০), ভি-এইড কর্মসূচি (১৯৫২) উল্লেখ করার মতো। এ সময় কতিপয় সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গ্রাম বাংলার উন্নয়নে যে সমস্ত চিন্তাভাবনা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে গুরু সদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন (১৯১৬), এন এম খানের পল্লী মঙ্গল সমিতি (১৯৩১), টিআইএম নুরুন্নবী চৌধুরীর খাল খনন কর্মসূচি (১৯৩৪), হাফেজ মোঃ ইসহাকের স্বনির্ভর ও সমবায় কার্যক্রম (১৯৩৬) উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের অবদানও কম নয়। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব কর্মকাণ্ড পল্লী উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর ১৯৫৯-৬০ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের উপায় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করা হয়। বার্ডের গবেষণালব্ধ ফসল 'দ্বিস্তর সমবায় সমিতি' যা সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে সমগ্র দেশে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হতে থাকে। আখতার হামিদ খান এ ধারণার উদ্ভাবক।

শুরুতে দ্বিস্তর সমবায়ের ক্ষেত্রে গ্রামের কৃষি, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, মৎস্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা এবং ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে গ্রামের সম্পদ উপজেলা পর্যায়ে সরকারি সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বিক গ্রামোন্নয়নের কথা বলা হয়। 'টার্গেট গ্রুপ অ্যাপ্রোচ' নিয়ে সকল সম্পদ সমিতির মাধ্যমে গ্রামের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে পৌঁছানোই ছিল মূল লক্ষ্য। যেহেতু গ্রামগুলো প্রধানত কৃষিভিত্তিক, সেহেতু প্রথমে গ্রামের কৃষকদের টার্গেট করা হয়। গঠন করা হয় গ্রাম পর্যায়ে কৃষক সমবায় সমিতি (কেএসএস) এবং থানা পর্যায়ে থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (টিসিসিএ)। তবে কেএসএস গঠনের ফলে কৃষির উৎপাদন বাড়লেও গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ঘটেনি। ভূমি-মালিক কিংবা মধ্যবিত্ত কৃষক ক্রমশ ভূমিহীন অথবা কৃষি মজুর বা শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে। কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির পরীক্ষাগার এলাকাতে ১৯৬০ সালে ভূমিহীন ছিল ৩০ শতাংশ, ২০০৫ সালে সেখানে এ সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ (৫৮ শতাংশ) হয় (হোসেন ও রহমান, ২০০৫:২৩)। দ্বিস্তর সমবায়ের ফলে দেশের কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন এলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিবার পরিকল্পনা, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নয়ন ঘটেনি। এক সময় ধারণা করা হয়েছিল যে, কৃষকের উন্নয়ন করে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় গঠন করা হয় বিভিন্ন শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সংগঠন, মহিলা সমবায় সমিতি, বিত্তহীন পুরুষ ও বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতি ইত্যাদি। পাশাপাশি গ্রামে কাজ করছে সমবায় অধিদপ্তর পরিচালিত সাধারণ সমবায় ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সংগঠন। এসব কর্মসূচি যে ব্যর্থ হয়েছে তা নয়। তবে আরও পরিকল্পিত ও সমন্বিত উপায়ে গ্রামে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে কিভাবে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করা যায়, তা নিয়ে ষাটের দশকের চিন্তাভাবনার মূল ধারণা ঠিক রেখে বোর্ড ১৯৭৫ সালে নিজস্ব প্রায়োগিক গবেষণা কর্ম হিসাবে 'টোটাল ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট' (টিভিডিপি) হাতে নেয়। ১৯৮৩ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)। এর আওতায় গঠিত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির মূল লক্ষ্য হলো গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় সকল পেশা-শ্রেণির জন্য গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন করা।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায়

সমবায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। এ আন্দোলন শুরু হয় মূলত সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে। জানা যায় ব্রিটিশ সরকারের অব্যাহত শাসন ও নিপীড়নের ফলে সাধারণ জনগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে তাদের মধ্যে অস্থিরতা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসন টিকিয়ে রাখা, বর্ধিত রাজস্ব আদায়, দরিদ্র কৃষকদের ঋণ সরবরাহ এবং কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা ঘটে। সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিকে একত্রিত করে তা লাভজনক বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন সমবায় আন্দোলনের উল্লেখ করে সম্পত্তির উপরে শ্রমের আর্থ-রাজনৈতিক জয়ের কথা বলেছেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯১:৭৭)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত করে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্যে লাভ করাকে সমবায় নীতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোক-ব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষা, দ্বেষ, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা-এত অশান্তি। সমবায় প্রণালীতে অনেকে আপন শক্তিকে যখন ধনে পরিণত করতে শিখবে তখনই সর্বমানবের স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপিত হবে' (ঠাকুর, ২০০৪: ৩৫৬)।

জানা যায়, বাংলা তথা ভারতীয়

উপমহাদেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বলয়ে ভূমি সর্বদা নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশের ভূমি ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা অনুসারে জমিদাররা ছিল সরকার ও কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট। জমিতে তাদের কোনো দখলি স্বত্ব ছিল না। এ বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদেরকে জমির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জমিদাররা ছাড়াও এ বন্দোবস্তের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব ঘটে। এদের উত্থান ও উৎপাতের ফলে ভূমি থেকে কৃষকদের ক্রমাগত উচ্ছেদ, উচ্চহারে খাজনা নির্ধারণ প্রভৃতির দরুন সৃষ্ট ভূমিহীনতা, মহামারি ও দুর্ভিক্ষ তৎকালীন অর্থনীতির সর্বস্তরে ব্যাপক ও বিস্তৃত বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ১৮৭২ সালে ভারতে ভূমিহীনদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭৫ লক্ষ। এছাড়া ১৮০২ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে ২৯টি দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এসব কারণে প্রজা সাধারণ ও জমিদারদের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে এবং জমিদারদের উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে কৃষকরা প্রায়শ বিদ্রোহ শুরু করে। আঠারো শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতকব্যাপী ভারতীয় উপমহাদেশে এরূপ অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসবের মধ্যে ১৮৭২-৭৩ সালের পাবনার কৃষক বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের মতো প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে কৃষকদের সুদ ব্যবসায়ী মহাজন কিংবা ভূস্বামীদের কাছে ধর্না দিতে হতো। ফলে এখানেও তারা শোষিত হতো। এ সব পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৎকালীন সরকার ১৮৭৫-৯১ সময়কালে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন, কৃষি বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন (১৮৮৫), কৃষিঋণ আইন (১৮৮৪), ভূমি উন্নয়ন ঋণদান আইন (১৮৮৩) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। বেশ ক'টি দুর্ভিক্ষ কমিশনও গঠিত হয়। অবশেষে সরকার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী হয়।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষকের কল্যাণ সাধনের জন্য ১৯০৪ সালে সমবায় সমিতির আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে সমবায় আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ আন্দোলন শত বছরের মাইলফলক পেরিয়ে শুধু কৃষিক্ষেত্রে নয়, অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে আবশ্যক উপাদানে পরিণত হয়েছে। উৎপাদনসহ সকল ক্ষেত্রেই সমবায় নীতির প্রয়োগ সম্ভব। দারিদ্র্য ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমবায় হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের প্রধান উপায়। বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত। সনাতন চাষপদ্ধতি, মূলধনের স্বল্পতা,

সেচের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদি এদেশের কৃষির প্রধান সমস্যা। এসব সমস্যার সমাধান করে কৃষি উন্নয়নে সমবায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে (হক ও রহমান, ২০০৫: ৩০০)। এছাড়া দেশে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল কর্মসূচিতেই সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। তাছাড়া শহর এলাকায়ও গৃহনির্মাণ, শিল্পপ্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় আন্দোলনের প্রভাব তুলে ধরা হলো-

ক. সমবায় আন্দোলনের ফলে কৃষকের সাথে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি বা উপকরণের যোগাযোগ ঘটেছে, সেচ এলাকা বেড়েছে। ফলে দেশে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছে।

খ. এ আন্দোলনের ফলে ইউনিট প্রতি কৃষি উৎপাদন বেড়েছে, কৃষিক্ষেত্রে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সর্বোপরি জনগোষ্ঠীর উপার্জন বেড়েছে।

গ. এ আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষ অধিক হারে সংগঠিত হয়েছে, প্রশিক্ষণ পেয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. গ্রাম পর্যায়ে নেতৃত্বেও সোপান সৃষ্টি করেছে এবং নারীদের পরিবারসহ নানা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে উঠেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে।

চ. স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়েছে।

ছ. গ্রামীণ ভূমিহীন ও নারীদের সংগঠিত করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

জ. এ আন্দোলন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং জনসাধারণের মধ্যে একতা, মিতব্যয়িতা, সততা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে।

উপসংহার

সমবায় আন্দোলন দেশের একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পৃথিবীর অন্যান্য দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায়, বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনও নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমান সরকার অবশ্য সমবায় আন্দোলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এ আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছেন। ইতোমধ্যে দেশে বিভিন্ন প্রকার সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন; বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। পৃথিবীতে অনেক উন্নত রাষ্ট্রই সমবায়ের কৌশলকে অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। তাই সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এদেশে সমবায় আন্দোলন সফল হতে পারে না। দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্য বিনির্মাণ ও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের স্বার্থে দেশে ব্যাপকভিত্তিতে সমবায় আন্দোলনকে আরো বেগবান করা অপরিহার্য।

তথ্যনির্দেশ

- রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, ঢাকা: ঐতিহ্য, জানুয়ারি ২০০৪
- সুরভি বন্দোপাধ্যায়, সমাজবিজ্ঞানের পরিচয়, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ডিসেম্বর ১৯৯১
- মোহাম্মদ লুৎফুল হক ও মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের অর্থনীতি, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, মার্চ ২০০৫
- এটিএম আলতাফ হোসেন ও মোঃ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ সমবায়ের ক্রমবিকাশ, হ্যান্ডআউট, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া, ৪-৯ জুন ২০০৫
- সিরাজুল ইসলাম, বাংলাপিডিয়া, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩
- বাংলা বিশ্বকোষ (৪র্থ খণ্ড), ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, নভেম্বর ১৯৭৬
- সমীর কুমার বিশ্বাস, সমবায় কার্যক্রমের সাফল্য আনয়নে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব, জাতীয় সমবায় দিবস সংখ্য ২০০৯, জেলা সমবায় দপ্তর, খুলনা, ৭ নভেম্বর ২০০৯
- মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, সমাজদর্শনের কয়েকপাতা, রাজশাহী: ইমপিরিয়্যাল বুকস, অক্টোবর ১৯৯৫
- আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান, রাজশাহী ইউরেকা বুক এজেন্সি, মার্চ ২০০১
- মো. আবদুল বাকী চৌধুরী, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়, দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩ নভেম্বর ২০২৪

খ. ম. রেজাউল করিম
সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
সরকারি মাইকেল মধুসুদন কলেজ, যশোর।

সমবায় সমিতির সভার গুরুত্ব

সামিয়া সুলতানা

কতিপয় ব্যক্তি নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একত্রিত হয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে। সমবায় সমিতিতে সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চর্চা পরিলক্ষিত হয়। সমিতিতে প্রত্যেক সদস্যের শেয়ার ও সঞ্চয় অনুপাতে মুনাফা বণ্টন করা হয়। সমিতি পরিচালনা সদস্যদের নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটি করে থাকলেও তাদের প্রতিটি কাজের জন্য সাধারণ সদস্যদের নিকট জবাবদিহিতা রয়েছে। এজন্য সমিতির সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালায় সভা আহ্বানের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবার সময় সম্পর্কেও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। এছাড়া সভায় কি ধরনের কার্যাবলি সম্পাদিত হবে,

কোরাম কি হবে সে সম্পর্কেও বিভিন্ন ধারা ও বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

সমবায় সমিতির চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ১৬(১) ধারায় বলা হয়েছে, এই আইন, বিধি এবং উপ-আইনের শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যেক সমবায় সমিতির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এর সাধারণ সভার উপর বর্তাবে এবং ১৬ (২) ধারায় বলা হয়েছে, সাধারণ সভা আহ্বান এবং এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি ও উপ-আইন অনুসরণ করতে হবে।

সভার প্রকারভেদ

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ১৭(১) অনুযায়ী সমবায় সমিতি এর সদস্যগণের সমন্বয়ে দুই প্রকার সভা অনুষ্ঠান করতে পারে, যথা : বার্ষিক সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা।

১৭(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা বৎসরে একবার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে এবং অন্য যেকোনো সাধারণ সভা বিশেষ সাধারণ সভা নামে অভিহিত হবে।

উভয় প্রকারের সাধারণ সভা এই আইন ও বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে, তবে সমিতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপ-আইনেও এই ব্যাপারে অতিরিক্ত বিধান থাকতে পারে।

কখন সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ১৭(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা এর নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন হবার ৬০ দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

তবে সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্তরূপ সময়ের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হবার যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, তা হলে নিবন্ধক উক্ত সময়সীমা সর্বোচ্চ ৬০ দিন বৃদ্ধি করতে পারবেন।

ধারা ১৭(৮) অনুযায়ী কোনো সমবায় সমিতি নিম্নলিখিত কারণে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারে, যদি-

ক. এই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত সভা আহ্বানের প্রয়োজন হয়; (২২ ধারা)

খ. ব্যবস্থাপনা কমিটি কোনো বিশেষ কারণে উক্ত সভা আহ্বান প্রয়োজনীয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; (৩৯ বিধি)

গ. অনধিক পাঁচশত সদস্য বিশিষ্ট সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে একপঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আবেদন করেন;

ঘ. এইরূপ সভা আহ্বানের জন্য নিবন্ধকের নির্দেশ থাকে।

এছাড়া ধারা ১৭(৯) এ বলা হয়েছে, নিবন্ধক বা তাঁর দ্বারা লিখিত নির্দেশবলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো সমিতির বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করতে পারবেন যদি ঐ সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নিবন্ধকের নির্দেশে বা সদস্যদের লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে সাধারণ সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হয়।

সাধারণ সভার নোটিশ জারির পদ্ধতি

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১৪ বিধিতে সাধারণ সভার নোটিশ জারির পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ বিধি অনুযায়ী নোটিশ জারির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় অনুসরণ করতে হবে-

- ব্যবস্থাপনা কমিটি বা উহার নির্দেশে সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তা কিংবা নিবন্ধক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।
- ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভা উল্লিখিত সভা অনুষ্ঠানের ১৫ দিন পূর্বে প্রত্যেক সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ মারফত অবহিত করতে হবে।
- ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভা কিংবা বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৬০ দিন পূর্বে জারি করতে হবে।

সাধারণ সভার নোটিশে সভার স্থান ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণের স্থান, তারিখ, সময় এবং অন্যান্য আলোচ্যসূচি ও গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ থাকতে হবে।

জাতীয় সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণির জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় সাধারণ সভায় নোটিশ প্রচার করতে হবে।

১৪(৫) বিধি অনুযায়ী নোটিশ জারির পদ্ধতি নিম্নরূপ-

ক. সার্টিফিকেট অব পোস্টিং অথবা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে, বা

খ. রেজিস্টারে প্রাপ্তি স্বাক্ষর গ্রহণের মাধ্যমে, বা

গ. ডিজিটাল পদ্ধতি বা ই-মেইলের মাধ্যমে, বা

ঘ. স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নোটিশ জারি করা যাবে।

উপরোক্ত যেকোনো দুইটি পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও কোনো সদস্য নোটিশ প্রাপ্ত না হলে তার অনুপস্থিতির কারণে কোন সভার কার্যক্রম অবৈধ হবে না।

তলবি সাধারণ সভা

উল্লিখিত দুই ধরনের সভা ছাড়াও আরও এক ধরনের সাধারণ সভা সমবায় সমিতিতে হতে পারে। যেটি তলবি সভা নামে অবহিত। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ

উদ্দেশ্যে এই সভা আহ্বান করা হয়।

তলবি সাধারণ সভার নোটিশ সম্পর্কে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১৫ বিধিতে বলা হয়েছে।

১৫ বিধি অনুযায়ী তলবি সাধারণ সভার নোটিশে তলবকারী সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষরসহ উক্ত সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে হবে এবং উক্ত নোটিশ সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

সাধারণ সভার কার্যাবলি

সমবায় সমিতি সাধারণ সভার কার্যাবলি সম্পর্কে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ১৭(৪) ধারা বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ সভার কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

ক. বিগত বার্ষিক সাধারণ সভাসহ বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন;

খ. ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা;

গ. বার্ষিক হিসাববিবরণী বিবেচনা ও অনুমোদন;

ঘ. উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা। তবে শর্ত থাকে যে, নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রের এক কপি সাধারণ সভার নোটিশের সাথে প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করতে হবে;

ঙ. পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন:

চ. ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;

ছ. সমবায় সমিতির কোনো সদস্য বা কর্মচারী কর্তৃক কোনো অভিযোগ বা সদস্যপদ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে কোনো নোটিশ সমিতিতে দাখিল করা হলে উক্ত বিষয়ে শুনানি, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

জ. সমবায় সমিতির কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়, তাদের বেতন নির্ধারণ ও সার্ভিস রুল অনুমোদন;

ঝ. সমিতির নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা তদন্ত রিপোর্টে উল্লিখিত বিষয়ে নিবন্ধকের বরাবরে প্রেরণের জন্য পরিপালন পত্র অনুমোদন;

ঞ. ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল বা বিশেষ কোনো সদস্যের বহিষ্কার বা সমিতির অন্য কোনো সদস্যকে বহিষ্কার;

ট. উপ-আইন সংশোধন বা পুনঃপ্রণয়ন করা।

বিশেষ সাধারণ সভার কার্যাবলি সম্পর্কে ১৭(১২) ধারায় বলা হয়েছে যে, উপ-ধারা ১৭(৪) এ উল্লিখিত যেকোনো বিষয়ে বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

সাধারণ সভার ক্ষমতা

সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১৮ বিধিতে সাধারণ সভার ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিধি ১৮ অনুযায়ী সাধারণ সভা সমিতির কার্যক্রম এবং বিশেষ করে ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরীক্ষা করবে এবং সমিতির বার্ষিক বাজেট, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রস্তাব বাস্তবতার আলোকে যাচাইপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সমিতির স্বার্থে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা সাধারণ সভার থাকবে।

তবে যে সকল সমবায় সমিতিতে সরকারের শেয়ার, ঋণ ও গ্যারান্টি আছে সে সকল সমবায় সমিতির বার্ষিক বাজেট এবং ১০,০০,০০০ টাকার বেশি মূল্যের যন্ত্রপাতি, উপকরণ বা যানবাহন ক্রয় এবং যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সাধারণ সভায় অনুমোদনের পর নিবন্ধকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

আরও শর্ত থাকে যে, উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির বাজেট অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকের সুপারিশ বা মতামত প্রদানের সুযোগ থাকবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বহিষ্কার ও সদস্য নির্বাচনের বিষয়ে সাধারণ সভার এখতিয়ার

সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বহিষ্কার ও সদস্য নির্বাচন করার এখতিয়ার সম্পর্কে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ১৭(১০) ও ১৭(১১) ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ধারা ১৭(১০) এ বলা হয়েছে, সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থাপনা কমিটির যেকোনো বা সকল

নির্বাচিত সদস্যকে বহিষ্কার করা যাবে যদি এতদুদ্দেশ্যে উক্ত সাধারণ সভা আহ্বান করা হয় তবে এইরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যই সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।

ধারা ১৭(১১) এ বলা হয়েছে, যে সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্য বহিষ্কৃত হন সেই সভাতেই অপর একজন সদস্যকে তদস্থলে নির্বাচন করতে হবে এবং তিনি বা তাঁরা উক্ত কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন।

সাধারণ সভার সভাপতি

সভার কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজন একজন সভাপতির। সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১৬ বিধিতে সাধারণ সভার সভাপতি কে হবেন সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বিধি ১৬ অনুযায়ী সভাপতি সংক্রান্ত বিধান নিম্নরূপ :

- ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভার নির্বাচন পর্বে নির্বাচন কমিটির সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন।
- উপ-বিধি (১) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক সাধারণ সভায় সভাপতি নির্বাচন করতে হবে; তবে সাধারণ সভার সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সমিতির সভাপতি অথবা তাহার অবর্তমানে সহ-সভাপতি সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ তাদের মধ্য হতে একজনকে সভাপতি করবেন।
- সভাপতি যেকোনো সদস্যকে সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে সভাস্থল হতে বহিষ্কার করতে পারবেন এবং অনুরূপ আদেশপ্রাপ্ত সদস্য অনতিবিলম্বে সভাস্থল ত্যাগ করে সভাপতির অনুমতি ব্যতীত পুনরায় সভায় উপস্থিত হতে ও ভোট প্রদান করতে পারবেন না।
- সভা পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে, সভাপতি সভার কার্যক্রম স্থগিত করে মুলতবি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় ঘোষণা করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত সাধারণ সভা নির্বাচন কমিটির লিখিত রিকুইজিশন ব্যতীত স্থগিত কিংবা মুলতবি করা যাবে না।

সাধারণ সভার কোরাম

কতজন সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম হবে সে সম্পর্কে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ১৭(৫) ধারা এবং কোরাম না হলে কি করণীয় সে সম্পর্কে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১৭ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

ধারা ১৭(৫) অনুযায়ী যে সকল সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা একশত বা এর কম, সেই সকল সমবায় সমিতির সাধারণ সভার কোরাম হবে মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ; এবং সদস্য সংখ্যা একশত এর অধিক কিন্তু এক হাজারের কম হলে কোরামের জন্য সদস্য সংখ্যা হবে মোট সদস্য সংখ্যার এক চতুর্থাংশ; এবং এক হাজার বা তার অধিক সদস্যবিশিষ্ট সমিতির সভার কোরামের জন্য এর মোট সদস্য সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতি।

বিধি ১৭ এ সভার কোরাম বিষয়ে নিম্নলিখিত বিধান রয়েছে

১. নির্বাচন ব্যতীত সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সভায় কোরাম না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।
২. কোনো সমবায় সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টার মধ্যে কোরাম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হলে সাধারণ সভা মুলতবি হবে এবং সভার সভাপতি লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক ভিন্ন কোনো তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ না করলে পরবর্তী সপ্তাহে একই সময়ে একই স্থানে মুলতবি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৩. নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় কোরাম পূরণ না হলে সভা বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।
৪. মূলতবি সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য কোরাম পূরণের প্রয়োজন হবে না। তবে শর্ত থাকে যে, এরূপ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিবন্ধকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১৯ বিধিতে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিধি ১৯ অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সভার কার্যবিবরণী লিখিত এবং সংরক্ষিত হবে:

১. সমবায় সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবার অব্যবহিত বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সভার কার্যবিবরণী খাতায় লিপিবদ্ধ করে সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষর করতে হবে।
২. সাধারণ সভার কার্যবিবরণীসহ সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষরিত নামের তালিকার ছায়ালিপি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কিংবা সম্পাদক কর্তৃক সভা অনুষ্ঠানের অনধিক পনেরো দিনের মধ্যে নিবন্ধকের নিকট প্রাপ্তি স্বীকার প্রত্যয়নসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে এবং নিবন্ধক প্রাপ্ত তথ্যাদি ভবিষ্যৎ রেফারেন্সের জন্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।
৩. সাধারণ সভা অনুষ্ঠান বা কোনো সদস্যের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হলে নিবন্ধকের নিকট সংরক্ষিত তথ্য সভা অনুষ্ঠিত হবার কিংবা সভায় সদস্যের উপস্থিতির প্রমাণ বলে গণ্য হবে।

সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভোটানুষ্ঠান পদ্ধতি

সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি

সম্পর্কে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ২০ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। বিধি ২০ অনুযায়ী সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভোটানুষ্ঠান পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. নির্বাচন ব্যতীত সাধারণ সভায় উপস্থাপিত অন্য যেকোনো বিষয়ের উপর হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে এবং হস্ত উত্তোলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বা পরে অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশ সদস্য দাবি করলে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

২. যদি ভোট গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হলে সভাপতি কর্তৃক উপ-আইনের বিধান সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ে ও সুবিধাজনক স্থানে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

৩. কোনো বিষয়ে ভোট গ্রহণ করা হলে উক্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট সংখ্যা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে।

৪. সভার প্রতিটি সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হতে হবে এবং যদি ভোটের সংখ্যা সমান হয়, তাহা হলে সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোটে প্রদান করতে পারবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন

বিধি ২১(১) এ বলা হয়েছে, সমিতির সদস্য সংখ্যা যাই হোক না কেন, ভোটের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সদস্যদের উপস্থিতিতে ১ সদস্য ১ ভোট নীতিতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে, বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

(২) উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক ভোট গ্রহণযোগ্য হবে না।

সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতার ফলাফল

সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি বা এর সদস্য কি ধরনের ফলাফল ভোগ করবে সে সম্পর্কে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ১৭(৬) ও ১৭(৭) ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ধারা ১৭(৬) অনুযায়ী আইন ও বিধি মোতাবেক যথাসময়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে তজ্জন্য দায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্য বা সদস্যগণ উক্ত সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী নির্বাচনে সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে তিন বৎসরের জন্য অযোগ্য হবেন।

ধারা ১৭(৭) অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে পর পর তিন বৎসর যদি কোনো সমবায় সমিতির সাধারণ সভায় কোরাম না হয়, তবে ঐ সমিতি অবসায়নের যোগ্য বলিয়া নিবন্ধক আদেশ দিতে এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন, তবে পর পর দুই বৎসর কোরাম অর্জনে ব্যর্থ সমিতিকে নিবন্ধক এই বিষয়ে, সতর্ক করে দিবেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটি

প্রত্যেক সমবায় সমিতির যাবতীয় ক্ষমতা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইন, বিধি ও উপ-আইন মোতাবেক গঠিত একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা বিষয়ে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ৪২ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। বিধি ৪২ অনুযায়ী-

১. সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সভা সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে হবে।

২. প্রাথমিক সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্যূন প্রতিমাসে একবার এবং জাতীয় ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্যূন প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। তবে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির বিবেচনায় সভায় আলোচনাযোগ্য কোনো বিষয় না থাকার কারণে নির্ধারিত সময়ে সভা আহ্বান অপ্রয়োজনীয় মর্মে বিবেচিত হলে সভাপতির এরূপ নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নির্বাহী

কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বানের পরিবর্তে নোটিশের মাধ্যমে বিষয়টি কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করবেন।

৩. ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে সম-সংখ্যক সদস্য কোন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রদান করলে সভাপতি তাহার নির্ণায়ক ভোট প্রদান পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৪. ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্য কমিটির সভায় কোনো বিষয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা পোষণ করে সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানালে এবং উহা কমিটির সভা আহ্বানের পূর্বে পাওয়া গেলে উক্ত বিষয়টি আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার নোটিশ

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার নোটিশ প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ৪১ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। বিধি ৪১ অনুযায়ী নোটিশ জারির পদ্ধতি নিম্নরূপ :

১. আলোচ্যসূচিসহ সভার তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক সভার নোটিশ সমিতির উপ-আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রেরণ করতে হবে।

২. উপ-বিধি (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত নাই কিন্তু সমিতির স্বার্থে জরুরি ও প্রয়োজনীয় এরূপ কোনো বিষয় সভায় উপস্থিত সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিক্রমে সভায় উত্থাপন করা যাবে।

৩. ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরি সভার নোটিশ প্রদান করে আহুত জরুরি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী নিয়মিত সভায় সদস্যগণের অবগতির জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সভাপতি

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সভাপতি কে হবেন সে সম্পর্কে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ৪৩ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। সমিতির সভাপতি অথবা তার অবর্তমানে সহ-সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভাপতি ও সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজন সদস্যকে সভাপতি নির্বাচন করবেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কোরাম

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কোরাম সম্পর্কে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ৪৪ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। ৪৪ বিধি অনুযায়ী সমিতির উপ-আইনে যাই থাকুক না কেন ব্যবস্থাপনা কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কোরাম পূর্ণ হবে এবং কোরাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সভার কার্য আরম্ভ করা যাবে না এবং নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী একঘণ্টা পর্যন্ত কোরামের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোরাম পূর্ণ না হলে আহত সভা বাতিল বলে গণ্য হবে।

তবে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষেত্রে ৫ জন সদস্যে উপস্থিতিতে এবং যে সকল সমবায় সমিতিতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য রয়েছে, সে সকল সমিতির ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্যের অন্যূন ৫০ শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির তলবি সভা

ব্যবস্থাপনা কমিটির তলবি সভা সম্পর্কে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ৪৫ বিধিতে বর্ণনা করা হয়েছে। ৪৫ বিধি অনুযায়ী তলবি সভা করার পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- ব্যবস্থাপনা কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্য অন্যূন ৭ দিন সময় প্রদান করে সমিতির সভাপতিকে তলবি সভা আহ্বানের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন এবং উক্তরূপ তলবিপত্র প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিটির সকল সদস্যকে নোটিশ সভা প্রদান করে সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করবেন।
- সভাপতি তলবি সভা আহ্বান করতে অনাগ্রহী হলে সম্পাদক কিংবা নির্বাহী কর্মকর্তা উক্ত সভা আহ্বান করতে পারবেন এবং তলবি সভার জন্য প্রদত্ত তলবিপত্রে এরূপ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে যেই সকল সদস্য সভা তলব করতে চান তাদের স্বাক্ষরে সমিতির কার্যালয়ে জমা প্রদান করতে হবে।
- পূর্বে উল্লিখিত কোনো বিষয় ব্যতীত উক্তরূপ তলবি সভায় অন্য কোনো বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না।

সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় সমবায় সমিতির কাজের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, জবাবদিহিতা নির্ভর করে সঠিকভাবে সভা অনুষ্ঠান হচ্ছে কি না তার উপর। বেশির ভাগ সমিতির সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত, মামলার সৃষ্টি হয় সকলের মতামত না নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গোপনীয়ভাবে ব্যক্তিস্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে। সমিতিতে যদি নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়, সকল সদস্য মতামত প্রদানের সুযোগ পায় তাহলে ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কিত অভিযোগ অনেকাংশে কমে যাবে। সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুযায়ী নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের চর্চা সমিতিগুলোকে করতে হবে। তাহলেই সমবায় সমিতির কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হবে।

সামিয়া সুলতানা
উপনিবন্ধক
সমবায় অধিদপ্তর।

ঐশী করুণার তরে

মোছাঃ নূর-ই-জান্নাত

"দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা" ঢাকা বিভাগ তথা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সমবায় সমিতি। ঢাকা ক্রেডিট বা CCCUL নামেই এটি বেশী পরিচিত। আরও অনেক সমিতির মতোই এটির শুরুটা ছোট হলেও তারা আজীবন ছোটই থাকতে চায়নি। স্বপ্ন যত বড় দেখেছে তার চেয়ে বেড়েছে আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন হয়েছে আরও বড়। সদস্যদের মাঝে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাবার প্রবণতা থেকেই সমিতির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জনাব বাবু মার্কুজ গোমেজ এর বিকল্প ভাবতে থাকেন। যদি সুলভে এদের দেশেই উন্নত চিকিৎসা দেয়া যেত তাহলে সারাজীবনের সঞ্চয় ভেঙে বা ঋণ করে সদস্যদের বিদেশে যেতে হতো না। আবার সদস্যদের স্বাস্থ্যবিমার বিপরীতে সমিতিকেও

বছরে কোটি টাকার বেশী বিল পরিশোধ করতে হয়। ফলে সদস্য এবং সমিতি উভয়ের চিকিৎসা খাতে এই বিপুল ব্যয় পরিহার করে উল্টা এটাকে সমিতির আয়ের খাত বানাতে নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা মাথায় আসে সমিতির নেতৃবর্গের। ২০১৪ সালের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতিটি সিদ্ধান্ত নেয় তারা একটি হাসপাতাল বানাবে যার নাম হবে Divine Mercy বা ঐশী করুণা। শুধু ঢাকা ক্রেডিট নয়, এটি হতে যাচ্ছে সমবায়ীদের নিজস্ব অর্থায়নে তৈরি দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান।

হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর শুরু হয় প্রাথমিক কার্যক্রম। সমিতির অর্থায়নে হাসপাতাল বানানোর অনুমতি চাওয়া হয় সমিতির নিবন্ধক ঢাকা বিভাগের তৎকালীন যুগ্ম নিবন্ধক জনাব মোঃ রুহুল আমীন এর কাছে। তিনি হাসপাতাল অনুমোদনের সাথে সাথে নির্মাণ কমিটিতে দুইজন সরকারি প্রতিনিধি রাখার নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী ২০১৮ সালে রুহুল আমীন স্যার আমাকে আর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জনাব তাসলিমা খাতুন কে মনোনয়ন দেন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে।

সেই থেকে শুরু। গত প্রায় ৬ বছর ধরে ঢাকা ক্রেডিটের Divine Mercy হাসপাতাল টিমের সাথে কাজ করছি। মেডিকেলের কত টার্ম, অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতির নাম আর সেসবের কাজের কথা যে শুনেছি এই সময়ে!! আলহামদুলিল্লাহ। এত বড় প্রোজেক্টে কাজ করতে গিয়ে পার করতে হয়েছে অনেক অনেক প্রতিবন্ধকতা আর সমস্যার পাহাড়। করোনা মহামারি, ডলার সংকট মাঝে মাঝে গতিকে কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ৪৫ হাজার সদস্যের স্বপ্নের স্রোতকে একেবারে থামিয়ে দিতে পারেনি কিছুই। এসব কারণে প্রাথমিক পরিকল্পনা মত ১১ নভেম্বর ২০২২ এ উদ্বোধনটা কেবল করা যায়নি। কিন্তু বাকি সবকিছু স্বপ্ন আর পরিকল্পনার চেয়েও প্রসারিত হয়েছে। যেমন কখনও যেন কোনো লোড শেডিং না হয় তাই পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আলাদা করে শুধু হাসপাতালের জন্যই বানিয়ে দিচ্ছে পাওয়ার স্টেশন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কালীগঞ্জ আর গাজীপুরকে যেন একদম তেজগাঁও এর পাশে এনে দিচ্ছে ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ। সমস্যা যে পথে এসেছে, সুবিধা করতে না পেরে ফিরে গেছে সেই পথেই। এসব কিছু যেন হাসপাতালের নামকরণ "ঐশী করুণা/অনুগ্রহ"কেই সার্থক করেছে।

গত ৩১ জানুয়ারি Blessing Ceremony উদযাপনের মাধ্যমে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট সর্বাধুনিক হাসপাতালের সফট ওপেনিং হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খ্রিস্ট সমাজের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যাক্তিত্ব কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি; আর্চবিশপ কেভিন র‍্যান্ডাল, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ এবং অন্যান্যরা। আপাতত সীমিত আকারে রোগী দেখা এবং ইমার্জেন্সি স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। সব ঠিক থাকলে এবছর মে মাসেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে হাসপাতালটির গ্র্যান্ড ওপেনিং। তখন পুরোদমে হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। তার আগে পর্যন্ত সময়টাকে হাসপাতালের 'কমিশনিং' পর্যায় বলা যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে ব্যয়ের চাপ কমাতে শুরুতেই প্রস্তাবিত ৩০০ শয্যার স্থলে ৫০টি শয্যা চালু করা হচ্ছে। পরবর্তীতে রোগীর সংখ্যা বাড়লে ধাপে ধাপে শয্যার সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০০ তে উপনীত করা হবে।

মিশরের একটি এবং ভারতের কয়েকটি হাসপাতালের সাথে ইতোমধ্যে চুক্তি হয়েছে পেশাগত এবং কারিগরি সহায়তা বিনিময়ের। শুরু থেকেই যে ব্যাপক পরিকল্পনা এবং হোমওয়ার্ক দিয়ে এটির কার্যক্রম শুরু হয়েছে তাতে এর সেবার গন্ডি অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা সেবার জগতে এটি একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে ইনশাআল্লাহ। আমি স্বপ্ন দেখি এটি দেশের এক নাম্বার হাসপাতাল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এক সময় অন্য দেশ থেকে মানুষ আসবে এখানে চিকিৎসা নিতে।

এই হাসপাতাল স্থাপনের ফলে শুধু যে সমিতির সদস্যরাই উপকৃত হবে এমন না, বরং সারা দেশের মানুষের চিকিৎসার জন্য উন্মুক্ত এই হাসপাতাল। গাজীপুরও এর নিকটবর্তী জেলার মানুষ ঢাকায় না এসেও অল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা পাবে। এমনকি ঢাকা ক্রেডিট ছাড়াও অন্যান্য সমবায় সমিতির সদস্যরাও চিকিৎসায় পাবে বিশেষ ছাড় Divine Mercy Hospital সম্পূর্ণ চালু হলে ডাক্তার নার্সসহ প্রাং ৯০০-১০০০ জন মানুষের সরাসরি কর্মসংস্থান হবে। এছাড়া হাসপাতালকে কেন্দ্র করে এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যবসা, দোকান-পাট, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, আবাসন, ফার্মেসিসহ নান ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার মাধ্যমে মানুষের জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। সম্ভাব্য বিদেশগামী রোগীদের সুলভে উন্নত চিকিৎসা দেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা খাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমিয়ে উল্টা আয়ের সুযোগ হবে। এমনকি বাংলাদেশ সরকার হাসপাতালের নানা ধরনের ক্রয় ও সেবা থেকে সরাসরি ভ্যাট-ট্যাক্সে মাধ্যমে ইতোমধ্যে উপার্জন করা শুরু করে দিয়েছে।

সন্দেহ নাই বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে এত বড় প্রোজেক্ট কখনও কোনো সমিতির নাই। এটি নিজেই একটি দৃষ্টান্ত যা আমরা উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করি বিভিন্ন ফোরামে। অথচ ১৯৫৫ সালের ৩ জুলাই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র ৫০ জন সদস্য ও ২৫ টাকা মূলধন নিয়ে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৫,৮২০ জন ও সমিতির নিজস্ব সম্পদ-পরিসম্পদের পরিমাণ ১২৭৩ কোটি টাকা। শুধু হাসপাতাল স্থাপন করেছে বলেই যে এটির সুনাম তা কিন্তু নয়! ঢাকা ক্রেডিট ইতোমধ্যে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে একাধিকবার জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এমনকি হাসপাতাল স্থাপনও আসলে সমিতিটির বড় একটি মাস্টার প্ল্যানের ছোট্ট একটা টুকরা মাত্র।

Divine Mercy Hospital এর সামনের দিনগুলোর জন্য দোয়া ও শুভকামনা। ফি আমানিল্লাহ।

মোছাঃ নূর-ই-জান্নাত
উপ নিবন্ধক
বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা

আপিল মামলা ব্যবস্থাপনা

সমবায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ পদ্ধতি

মোঃ রবিউল ইসলাম

"দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" সমবায়ের মূলনীতি হলেও সমবায় সমিতিতে সাধারণ সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, কর্মচারী, সমবায় বিভাগ এবং সমবায় সমিতির সাথে লেনদেনকারীদের পরস্পরবিরোধী স্বার্থের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। সমবায়ে উদ্ভূত দ্বন্দ্বসমূহ নিরসনে সমবায় সমিতি আইনে ৪৯ ধারায় তদন্ত, ২২ ও ৮৩ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ৫০ ধারায় ডিসপুট মামলার বিধান রয়েছে। এছাড়াও সমবায় সমিতির বিভিন্ন বিষয়ে সমবায় বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রদত্ত উক্তরূপ সিদ্ধান্তে কোনো পক্ষের সংক্ষুব্ধ হওয়ার সুযোগ থাকে।

সমবায়ের বিরোধ নিষ্পত্তি একটি দেওয়ানী প্রক্রিয়া। দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ১৯০৮ এর বিধান অনুসারে যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তিতে প্রদত্ত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল অথবা রিভিশন এ যেকোনো

একটি সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক সময়ে ডিসপুট মামলায় সালিশকারী প্রদত্ত সিদ্ধান্ত যথাযথ এবং আইনানুগ হয় না। সেমতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ৫০(৪) ধারায় ডিসপুট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সুযোগ রয়েছে। সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ১১৯(৪) বিধি মোতাবেক নিবন্ধন বাতিলসহ নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে নিবন্ধকের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপিল দায়ের করা যাবে।

যারা আপিল মামলা দায়ের করতে পারবেন

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ৫০(৪) ধারা মতে, "(৪) এই ধারার অধীন সালিসকারী প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উহা প্রদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ পক্ষ নির্ধারিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবে না" সেমতে ডিসপুট মামলার রায়ে সংক্ষুব্ধ যেকোনো পক্ষ এমনকি ডিসপুট মামলার বাদী বা বিবাদী না হওয়া সত্ত্বেও ডিসপুট মামলার রায়ে ক্ষতিগ্রস্ত তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক আপিল মামলা দায়েরের সুযোগ রয়েছে। সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ১১৯(৪) বিধিতে বলা হয়েছে, "নিবন্ধন বাতিলসহ যেকোনো নির্বাহী আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আদেশ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে আপিল করিতে পারিবেন।" সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিবন্ধক কর্তৃক অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, নির্বাচন কমিটি নিয়োগ, ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন প্রদান, নিরীক্ষা এবং তদন্ত সম্পাদন, ব্যবস্থাপনা কমিটি ভঙ্গাকরণ কিংবা কমিটির কাউকে বহিষ্কারকরণ, সমিতির অবসায়ন, নিবন্ধন বাতিলসহ বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। এরূপ যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আদেশ প্রদানের ১ (এক) মাসের মধ্যে আপিল দায়ের করতে পারেন।

লক্ষ্যণীয় যে, সমবায় সমিতি আইন এর ৮৩ ধারায় প্রদত্ত সিদ্ধান্ত একটি আধা-বিচারিক ব্যবস্থা, নির্বাহী আদেশ নয়। ৮৩ ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকলে সে বিষয়ে আপিল দায়ের করা যাবে, সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নয়। সমবায় সমিতি বিধিমালা এর ১০(২) বিধি মোতাবেক সমিতির সদস্যপদ সংক্রান্ত বিরোধ কিংবা ৩০(৫) বিধি মোতাবেক ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিরোধে নিবন্ধকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ায় উক্ত বিষয় আপিলযোগ্য নয়। একই বিধিমালা এর ২৯ বিধি মোতাবেক নির্বাচনি আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হওয়ায় এ বিষয়ে আপিল দায়েরের সুযোগ নেই। উক্ত বিষয়সমূহ আপিলযোগ্য নয় বিধায় সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বরাবরেই রিভিউ (পুনর্বিবেচনা) আবেদন দাখিল করা যেতে পারে।

আপিল মামলা দায়েরের সময়সীমা

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ৫০(৪) ধারা এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১১৯(৪) বিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে। বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়েরে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যা সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে বিলুপ্ত হবে। তবে তামাদি আইন, ১৯০৮ এ উল্লিখিত কয়েকটি ধারায় এর ব্যতিক্রমতার সুযোগ রয়েছে। উক্ত আইনের ০৪ ধারা মোতাবেক যে তারিখে সময়সীমা উত্তীর্ণ হয় সে তারিখে অফিস বন্ধ থাকলে অফিস খোলার পরবর্তী তারিখেই আপিল দায়ের করতে হবে। ০৫ নং ধারা মোতাবেক আপিল দায়েরের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণ রয়েছে মর্মে বিবেচিত হলে বিলম্ব প্রমার্জনপূর্বক আপিল গ্রহণ করা যাবে। একই আইনের ১২ নং ধারা মোতাবেক সমুদ্দেশ্যমূলক কার্যধারায় এখতিয়ারাধীন দপ্তরে ব্যয়িত সময় প্রমার্জিত হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিসপুট মামলার সার্টিফাইড ডকুমেন্টস এর জন্য আবেদন করা হলে ডকুমেন্টস প্রাপ্তিতে বিলম্বকাল প্রমার্জিত হবে।

যার বরাবরে ডিসপুট মামলা দায়ের করা যাবে

সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১১৯ নং বিধি মোতাবেক প্রাথমিক সমবায় সমিতির বিরোধে সালিশকারী কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগের উপ-নিবন্ধক (বিচার) বরাবরে, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির বিরোধে উপ-নিবন্ধক (বিচার) প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় যুগ্মনিবন্ধক বরাবরে আপিল দায়ের করতে হবে। জাতীয় সমবায় সমিতির বিরোধে অতিরিক্ত/যুগ্মনিবন্ধক সালিশকারী হলে নিবন্ধক ও মহাপরিচালক বরাবরে আপিল দাখিল করতে হবে। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক স্বয়ং সালিশকারী হলে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব বরাবরে আপিল দাখিল করতে হবে। আপিল মামলায় আপিল গ্রহণকারী কর্মকর্তাই আপিল নিষ্পত্তি করবেন। আপিল মামলায় সালিসকারী (আরবিট্রেটর) নিয়োগ করার সুযোগ নেই।

আপিল মামলা ব্যবস্থাপনা

আপিল মামলা দাখিল করা হলে দপ্তরের আপিল মামলা রেজিস্টারে এন্ট্রিপূর্বক মামলার ক্যালেন্ডার সনভিত্তিক নম্বর প্রদান করতে হবে এবং দরখাস্তকারীকে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র (রিসিভ কপি) প্রদান করতে হবে। আপিল মামলার আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অবশ্যই মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। অনিবার্য কোনো কারণে সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবরে অতিরিক্ত আরো

আপিল মোকদ্দমার আরজি/আবেদন/দরখাস্তের নমুনা :

আপিল মোকদ্দমার আবেদনের সুনির্দিষ্ট কোনো ফরম/ফরম্যাট নেই। ডিসপুট আবেদন নিমোক্ত ফরম্যাটে দাখিল করা যেতে পারে :

১০০ টাকার কোর্ট ফি সংযুক্ত করুন

আপিল মামলা নম্বর: (অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

বরাবর

..... (আপিল গ্রহণকারী কর্মকর্তার পদবি)

..... (আপিল গ্রহণকারী কর্মকর্তার কর্মস্থল)

বিষয় : সমবায় সমিতি আইন এর ৫০ ধারামতে আপিল মোকদ্দমা।

সূত্র : (আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষের স্মারক ও তারিখ/ডিসপুট মামলা নম্বর)

বাদী/দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা :	বিবাদী/প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা :

সাক্ষী/সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানা : (যদি থাকে)

(মোবাইল নম্বর/ই-মেইল অ্যাড্রেস সহ পূর্ণাঙ্গ পত্র যোগাযোগের ঠিকানা)

জনাব,

.....

..... (মূল বক্তব্য/মূল দরখাস্ত)

চাহিত প্রতিকার:.....

সংযুক্ত কাগজপত্রাদি: বাদী/দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

(প্রয়োজনে পৃথক কাগজ সংযুক্ত করা/একাধিক পাতা ব্যবহার করা যাবে। সংযুক্তিসমূহের জন্য পৃথক ফিরিস্তি ফরম ব্যবহার করা যাবে। ডিসপুট মামলার আপিলে নতুন কোনো দাবি উত্থাপন করা যাবে না)

সর্বোচ্চ ৬০ দিনের জন্য সময়বৃদ্ধির আবেদন করা যাবে। প্রতিটি আপিল মামলার জন্য পৃথক পৃথক নথি খুলে উক্ত নথিতেই ডিসপুট মামলাটি পরিপালন করতে হবে। উক্ত নথিতে পৃথক কোনো নোটশীট থাকবে না। নোটশীটের বিকল্প হিসেবে নথির বাম কভারে সংযুক্ত অর্ডার শীটে নথি পরিপালিত হবে। ডান কভারে পৃষ্ঠা নম্বরযোগে মামলার রেকর্ডাদি সংযুক্ত থাকবে।

প্রাপ্ত আবেদনটি প্রাথমিকভাবে আপিল মামলা হিসেবে গ্রহণীয় না হলে অনুচ্ছেদ নং ০২ এ আবেদন/আরজি ফেরত প্রদানের আদেশ প্রদান করা যাবে। অনুচ্ছেদ নং ০৩ এ পক্ষসমূহ ও সংশ্লিষ্টদের শুনানি গ্রহণের জন্য সময়, তারিখ এবং স্থান উল্লেখপূর্বক নোটিশ ধার্য তারিখের অন্তত: ০৭ দিন পূর্বে জারি করতে হবে। নোটিশ সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ১১৪ নং বিধি মোতাবেক জারি করতে হবে। উক্ত বিধির মর্মানুসারে বিশেষ বাহক মারফত (প্রাপ্তিস্বীকারযোগে / হাতে হাতে), রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে, সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তার (ম্যানেজার/সম্পাদক/এমডি) মাধ্যমে, কাউকে খুঁজে পাওয়া না গেলে সর্বশেষ আবাসস্থল/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লটকিয়ে (লটকানোর সময় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের লিখিত সাক্ষ্য সময় ও তারিখ উল্লেখ করে গ্রহণপূর্বক) নোটিশ জারি করা যাবে। সমিতির নির্বাহী কর্মকর্তার (ম্যানেজার/সম্পাদক/এমডি) নোটিশ প্রাপ্ত হলে সমগ্র সমিতি নোটিশপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। নোটিশ জারির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর আদেশ নং ০৫, বিধি ০১ থেকে বিধি ৩০ অনুসরণ করা যেতে পারে। বাদীপক্ষ ব্যতীত অন্যান্য নোটিশ প্রাপকের বরাবরে নোটিশের সাথে আরজির কপি সংযুক্ত করতে হবে এবং শুনানিকালে স্বীয় লিখিত বক্তব্য ও প্রমাণাদি উপস্থাপনের আহ্বান জানাতে হবে। নোটিশের স্মারক নং মামলার আদেশের তারিখ কলামে এন্ট্রি প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং ০৪ এ শুনানি গ্রহণকালে অর্ডার শীটে পক্ষগণের স্বাক্ষর কলামে সংশ্লিষ্টদের হাজিরা/স্বাক্ষর গ্রহণ করতে যাবে। প্রয়োজনবোধে পৃথক হাজিরা শীটে স্বাক্ষর গ্রহণ করে পক্ষগণের স্বাক্ষর কলামে 'হাজিরা তালিকা সংযুক্ত' লিখে রাখা যাবে। শুনানি গ্রহণকালে প্রত্যেকের বাচনিক বক্তব্যের সারাংশ পৃথক পৃথক ফর্দে

অর্ডার শীটের নমুনা নিম্নরূপ :

অর্ডার সিট ফরম

আদেশ ও বিবরণীর ক্রমিক নং	মামলার আদেশের তারিখ	আদেশ ও বিবরণী	আপিলাত কর্মকর্তার স্বাক্ষর	পক্ষগণের স্বাক্ষর
০১	.....	ডায়েরি নং-..... , তারিখঃ ..... খ্রিস্টাব্দ ডায়েরিকৃত আবেদনখানা ..... হতে প্রাপ্ত। আবেদনে ..... প্রার্থনা করা হয়েছে। আবেদনে ১০০/- টাকার কোর্ট ফি সংযুক্ত রয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনার জন্য নথি উপস্থাপন করা হলো। (নথি উপস্থাপনকারী)		
০২	.....	আবেদনটি সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ১১৯ বিধি অনুসারে আপিল মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হলো। আগামী ..... খ্রিস্টাব্দ ..... ঘটিকায় ..... স্থানে শুনানি গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশ করা হোক। (আপিল আবেদনের প্রাপক কর্মকর্তা)		
০৩	.....	অনুচ্ছেদ ০২ এর নির্দেশনা মতে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য নথি উপস্থাপন করা হলো। (নথি উপস্থাপনকারী) (আপিলাত কর্মকর্তা)		
০৪	.....	অদ্য শুনানির দিন ধার্য আছে। ..... উপস্থিত রয়েছেন। উপস্থিত পক্ষসমূহের বক্তব্য গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ডাদি পরীক্ষণ করা হল। শুনানি মুলতবি করা হল। আগামী ..... খ্রিস্টাব্দে রায় ঘোষণার জন্য দিন ধার্য করা হলো। (সালিশকারী)		
০৫		বাদী ও বিবাদীর বক্তব্য এবং রেকর্ডাদি পর্যালোচনা ক. বাদীপক্ষের বক্তব্য: আরজিতে এবং গৃহীত শুনানিকালে মৌখিক বক্তব্যে বাদীপক্ষে দাবী করা হয় যে, ...		
		খ. বিবাদীপক্ষের বক্তব্যঃ শুনানিকালে দাখিলকৃত লিখিত বক্তব্য এবং প্রদত্ত মৌখিক বক্তব্যে বিবাদীপক্ষ জানানো হয় যে, ... গ. আপিলাত কর্মকর্তার পর্যালোচনা: মামলার বিচার্য বিষয়সমূহ: ১. মোকদ্দমাটি রক্ষণীয় কি না? ২. ..... ৩. ..... ৪. ..... ৫. বাদীপক্ষ চাহিত প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?		

সবশেষে নিম্নোক্ত ফরম্যাটে রায়/অ্যাওয়ার্ড জারি করা যেতে পারে :

আপিল মামলা নং .....
জনাব ..... (বাদী) বনাম জনাব ..... (বিবাদী)
রায়/অ্যাওয়ার্ড
আপিল মোকদ্দমা নং .....এর বাদীর আরজি, গৃহীত শুনানিতে উপস্থিত সকলের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ডাদি পর্যালোচনান্তে ..... (প্রদত্ত সিদ্ধান্ত)
অদ্য ..... খ্রিস্টাব্দের ..... মাসের ..... তারিখে আমার সিলমোহরযোগে রায় জারি করা হলো।
..... (আপিলাত কর্মকর্তার নাম)
..... (আপিলাত কর্মকর্তার পদবি)
ও
আপিলাত কর্মকর্তা
আপিল মামলা নং .....

লিখে বক্তব্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। কোনো পক্ষ শুনানিতে অনুপস্থিত থাকলে কিংবা শুনানির সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে আপিলাত কর্মকর্তা প্রয়োজনবোধে একাধিকবার শুনানি গ্রহণ করতে পারেন। আপিলাত কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নোটিশ/সমন ইস্যু করা হলে কিংবা কোনো তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনে নির্দেশ প্রদান করা হলে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত আদেশ পরিপালিত না হলে নিবন্ধক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি বা তল্লাশী পরোয়ানা (অ্যারেস্ট/সার্চ ওয়ারেন্ট) ইস্যু করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বরাবরে আবেদন করতে পারবেন। রায় ঘোষণার তারিখ অর্ডারশীটে লিখে পক্ষসমূহের অবগতির স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে। সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ১১৫ নং বিধি অনুসারে বিরোধীয় পক্ষসমূহকে সরাসরি স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপন করবেন, আইনজীবীর মাধ্যমে নয়। বিশেষ প্রয়োজনে আপিলাত কর্মকর্তার অনুমতি গ্রহণপূর্বক আইনজীবী নন এমন কারো মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ নং ০৫(ক) এ পর্যালোচনাকালে বাদীপক্ষে (আরজি এবং বাদী ও বাদীপক্ষের সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত বাচনিক বক্তব্যে) উত্থাপিত দাবিসমূহ এবং দাবিসমূহের স্বপক্ষে প্রদত্ত যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণাদির গ্রহণযোগ্যতা প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, সার্কুলারসমূহের আলোকে যাচাইবাছাই করতে হবে। অনুচ্ছেদ নং ০৫(খ) এ পর্যালোচনাকালে বিবাদীপক্ষে (আরজির ওপর লিখিত বক্তব্য এবং বিবাদী ও বিবাদীপক্ষের সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত বাচনিক বক্তব্যে) উত্থাপিত দাবিসমূহ এবং দাবিসমূহের স্বপক্ষে প্রদত্ত যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণাদির গ্রহণযোগ্যতা প্রযোজ্য আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, প্রজ্ঞাপন, সার্কুলারসমূহের আলোকে যাচাইবাছাই করতে হবে। যাচাইবাছাই করে বাদীপক্ষের দাবির যুক্তিখন্ডনে উত্থাপিত তথ্যপ্রমাণাদির গ্রহণযোগ্যতা নিরূপণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং ৫(গ) এ সালিশকারীর পর্যালোচনা অংশে বাদী, বিবাদী এবং সাক্ষীগণের প্রদত্ত বক্তব্য, উত্থাপিত রেকর্ডাদি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনা করে মামলার বিচার্য বিষয়সমূহ চূড়ান্তকরণপূর্বক (Issue Frame) সিদ্ধান্ত স্থির করতে হবে। বিচার্য বিচারসমূহের মধ্যে প্রথমেই মামলার রক্ষণীয়তা (Maintainability) নিশ্চিত করতে হবে। বিবাদীপক্ষে দাবী করা হোক বা না হোক বিচার্য মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ এবং বিচার করার উপযুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। মামলার বিচার্য বিষয়সমূহ তালিকাভুক্ত করে প্রতিটি বিষয়ে সালিশকারীর সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে বিবেচিত বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করতে হবে। বিচার্য বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি হবে বিধিবিধান। যেক্ষেত্রে বিধিবিধান সুস্পষ্ট নয় সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার (Natural Justice), সমতা ও সাম্যতা (Equity as well as Equality) এবং সুবিবেচনা (Discretion) প্রয়োগ করতে হবে। বিচার্য বিষয়াদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হলে বাদীপক্ষে চাহিত প্রতিকারের প্রাপ্যতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতে হবে।

আপিল মামলার রায় অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন

বাদী এবং বিবাদীপক্ষের উপস্থিতিতে আপিল মামলার রায় প্রদান করা হলে রায় পাঠ করে শোনাতে হবে। রায়ের কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে সংশ্লিষ্টদের বরাবরে ১৫ দিনের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে নির্দেশনা বা অনুরোধ জানানো যেতে পারে। কোনো পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ১২১ বিধিতে নির্ধারিত ফি ট্রেজারি চালানে/এ-চালানে বা একপে তে গ্রহণপূর্বক আপিল মামলার অর্ডার শীট, রায়ের কপি বা অন্যান্য কাগজপত্রের প্রত্যায়িত নকল (সার্টিফাইড কপি) সরবরাহ করা যেতে পারে।

মোঃ রবিউল ইসলাম
অধ্যক্ষ (উপ-নিবন্ধক), আঞ্চলিক
সমবায় প্রশিক্ষণ
ইনস্টিটিউট, নরসিংদী

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় সমবায়ভিত্তিক টেকসই অভিযোজনের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

আইরিন খানম

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে আসছে। এসব ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, টর্নেডো, নদীভাঙন, উপকূলে ভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি। এছাড়া সিসমিক জোন অর্থাৎ, ইউরেশিয়ান প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট ও বার্মা প্লেটের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকার কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশ নাজুক অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তবতা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এতে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক বিরূপ প্রভাবের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় ও নদীতীরবর্তী দারিদ্র্য ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার জীবন ও জীবিকা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত ও বাংলাদেশের বিপদাপন্ন পরিস্থিতি

গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২৫ (Global Climate Risk Index-2025) এর রিপোর্ট

অনুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্বের চরমভাবে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় ৭ম স্থানে রয়েছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্রান্থাম রিসার্চ ইনস্টিটিউট গত অক্টোবরে 'অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ ইকোনমিকস' নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে তারা দেখিয়েছে, বাংলাদেশে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ৪৬ শতাংশ বেড়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) এক হিসাব অনুযায়ী, ২০১০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির শিকার হয়েছে ১ কোটি ১৪ লাখেরও বেশি মানুষ। বৈশ্বিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এশিয়া-প্যাসিফিকে দুর্যোগজনিত মোট অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ঘটছে শুধু দক্ষিণ এশিয়ায়। এদিক থেকে সবচেয়ে নাজুক অবস্থানে থাকা দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্র ০.২৫ শতাংশের জন্য দায়ী হলেও আমাদের উপর এর প্রভাব মারাত্মক। বাংলাদেশে কার্বন নির্গমনে দায়ী মূলত কৃষি এবং জ্বালানি খাত। কৃষিখাতে ৪৪ শতাংশ এবং জ্বালানিখাতে ৩৯ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হয়। ২০৪০ সালে এটি সর্বোচ্চ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ৭ বছরে সংঘটিত দুর্যোগের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণায় ধারণা করা হয়েছে, প্রতি বছর ২৭ লাখ ১০ হাজার পরিবারের ১ কোটি ২১ লাখ মানুষের ওপর বর্ষার বন্যা, আকস্মিক বন্যা, নদীভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধস ও ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন জলবায়ু সংক্রান্ত দুর্যোগের প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়া কালবৈশাখী, শৈত্যপ্রবাহ ও শিলাবৃষ্টির মতো অন্যান্য দুর্যোগগুলোও বিবেচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্ন দেশ হিসেবে স্বীকৃত। জলবায়ু পরিবর্তনের ঊর্ধ্বগতি এবং এর প্রভাবে বিপদাপন্নতা আরো অনেকাংশে বেড়ে যাচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্যপ্রবাহ ও খরার মতো আপদগুলো নানা মাত্রা নিয়ে এ দেশে দুর্যোগ হিসাবে আঘাত হানতে পারে। ফলে গত দশকগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যবিমোচনের মতো পদক্ষেপগুলো হুমকির মুখে পড়বে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হবে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকা জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বেড়ে গেলে দেশের ১৭ ভাগ ভূমি পানিতে তলিয়ে যাবে। এতে প্রায় তিন কোটি মানুষ তাদের আবাসন হারাতে পারে, হারাতে পারে তাদের পরিচিত গ্রাম ও অসংখ্য সুখস্মৃতি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলায় সমবায়ভিত্তিক টেকসই অভিযোজন এর গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের চরম আবহাওয়াজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। এই পরিবর্তনে জনসংখ্যার যে অংশটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন, তারা হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। জলবায়ু পরিবর্তন ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর খাদ্য, পানি, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার অধিকার প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এবং সর্বোপরি মানসম্মত জীবনযাপনের অধিকার থেকে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করছে। জলবায়ু ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী অন্যত্র বিশেষত শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হলেও তারা ভিন্ন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয় যেমন খাদ্য সংকট, স্বাস্থ্যঝুঁকি, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপত্তা প্রাপ্তিতে সমস্যা, শ্রম বৈষম্য, শিশুশ্রম, যৌন হয়রানি, পাচার হওয়ার ঝুঁকি, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি। যদিও এই সকল দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারি এবং বেসরকারি অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তথাপি স্থানীয় লোকজনের নিজস্ব অভিযোজন সক্ষমতাই তাদেরকে রক্ষা করেছে যুগের পর যুগ। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় কমিউনিটি লেভেলে সচেতনতা ও সমন্বিত প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমেই টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া দুর্যোগমুক্ত সময়ে শস্য বহুমুখীকরণ ও ফসলের নিবিড়তা বাড়িয়ে দুর্যোগের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত করে ঝুঁকি যাচাই ও অভিযোজন নিশ্চিত করতে সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদে প্রণোদনাভিত্তিক সম্পদ ও অর্থের জোগান দিলে তারা ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে সমবায়ভিত্তিক যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব রয়েছে

- সমবায় সংগঠন ও টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি : সমবায়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের নিজস্ব শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমন্বিত তহবিল গঠন করা হবে। সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি, সমিতি ও হিসাব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যেটি একটি টেকসই আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে উপকূলীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও ব্যাংক ঋণের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পেয়ে নিজস্ব তহবিল থেকে বিনিয়োগ ও সহায়তার সুযোগ পাবে, যা তাদের টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে ভূমিকা রাখবে।
- দুর্যোগ মোকাবিলায় কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স : যেহেতু সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান, তাই সমাজের সকলকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব। দলগত নিজস্ব

অভিযোজন সক্ষমতার ফলেই আমাদের দেশের চরম ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বহু দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে আছে। বিভিন্ন সমবায় সমিতির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে একটি কমিউনিটির অভিঘাত মোকাবিলার নিজস্ব কৌশল অন্য কমিউনিটি/স্থানে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। সচেতনতামূলক বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং ক্ষুদ্র স্কীমে সহায়তার মাধ্যমে সমবায় দুর্যোগ মোকাবিলায় কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স গঠনে অবদান রাখবে।

- প্রশিক্ষণ: সমবায় সমিতির সদস্যদের সমবায় ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা, কৃষি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, ইকো-ট্যুরিজম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের জলবায়ু অভিযোজন, সুপেয় পানি সংরক্ষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে দক্ষ করে গড়ে তোলা যাবে। কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক একজন সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। আয়বর্ধনমূলক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের সমবায় সমিতি পরিচালনা, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানেরও সুযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষিত সমবায়ীগণের কার্যকর অংশগ্রহণে উপজেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিগুলো উৎপাদনমুখী উদ্যোগের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ :

মোটিভেশনাল ও সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ :

ক. জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সচেতনতা প্রশিক্ষণ;
খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ :

ক. সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;
খ. সমবায় সমিতির হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ;

আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ:

ক. গবাদিপশু পালন প্রশিক্ষণ;
খ. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ;
গ. পোল্ট্রি পালন প্রশিক্ষণ;
ঘ. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ;
ঙ. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে লবণ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ;

দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ :

ক. স্মার্ট কৃষি, জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
খ. কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ;
গ. পণ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ;
ঘ. হস্ত শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
ঙ. টেইলরিং, গার্মেন্টস, ব্লক-বুটিকস প্রশিক্ষণ;
চ. মিডওয়াইফ প্রশিক্ষণ;
ছ. ইকো-ট্যুরিজম প্রশিক্ষণ;
জ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
ঞ. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

- ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ : প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমবায়ীদের ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা যায়। এই ঋণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দুর্যোগ মোকাবেলায় দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো প্রস্তুতের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।
- ইকো-ট্যুরিজম সিস্টেম চালুকরণ : উপকূলীয় এলাকার সম্ভাবনাময় জায়গায় সমবায়ের মাধ্যমে ইকো-ট্যুরিজম সিস্টেম চালু করা যায়, যার ফলে পর্যটনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণকে উৎসাহিত করবে।
- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি : লবণাক্ততা সহিষ্ণু ও পরিবেশবান্ধব প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ এর জন্য প্রকল্প সহায়তায় সমিতিকে প্রদান করা হলে, এটি ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।
- জলবায়ু অভিযোজন সচেতনতা : প্রকল্প সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা ও প্রচারাভিযান পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। সমিতির সদস্যগণ সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এলাকার সামষ্টিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।
- দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ : সমবায়ভিত্তিক মালিকানা ও

ব্যবস্থাপনায় ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছাস প্রতিরোধে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র, উঁচু প্ল্যাটফর্ম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ এবং দুর্যোগ-সহনশীল রাস্তা নির্মাণ করা হলে, সমবায়ী মালিকানার ফলে স্থাপনাসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

- নারীর সচেতনতা তৈরি ও উন্নয়ন : নারীদের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সেলাই ও হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন নারীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং কিশোরী নারী স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ, গর্ভবতী নারীদের জন্য মিডওয়াইফ রাখার ব্যবস্থা করা যাবে।
- পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন : প্রকল্পের মাধ্যমে সকল সমবায়ীদের জন্য অভিঘাত পরবর্তী সময়ে পানিবাহিত বিভিন্ন চর্ম রোগ, ডায়রিয়ার জন্য ঔষধ ও স্যালাইনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ 'ফার্স্ট এইড' বক্স সরবরাহ করা যায়।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্য, মৎস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ ও বাজার লিংকেজ স্থাপন : প্রকল্পের অর্থ সহায়তায় সমিতির নিজস্ব জমিতে তাদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণে ওয়্যারহাউজ নির্মাণ এবং মৎস্য সংরক্ষণের জন্য সমিতির নিজস্ব জায়গায়/সরকারি খাস জমিতে হিমাগার নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দিলে প্রান্তিক উৎপাদকরা তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য যেমন পাবে, সাথে সাথে অসাধুদের চক্রান্ত বিফল হবে।
- কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ : প্রতি সমিতির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি যন্ত্রপাতি (ট্রান্সপ্লান্টার, পাওয়ার টিলার, হারভেস্টর ইত্যাদি) প্রকল্পের আওতায় ৯০% ভর্তুকিতে প্রদান করা যেতে পারে।
- কৃষি/মৎস্য উপকরণ ভর্তুকি/ ন্যূনতম মূল্যে কৃষকদের নিকট বিতরণ : কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন: সার, বীজ, সেচ, কীটনাশক, জৈব সার, জৈব বালাইনাশক এবং মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার উপকরণ ভর্তুকিতে /ন্যূনতম মূল্যে কৃষকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য সমিতিতে সরবরাহ করা যায়।
- সোলার প্যানেল : প্রকল্পের সহায়তায় প্রকল্প উপকারভোগীর বাড়ি এবং কৃষি জমিসহ তাদের নিজস্ব কর্মস্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা, যা কার্বন নির্গমন কমাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান : প্রকল্পের সহায়তায় সকল উপকারভোগীর পরিবারের জন্য একটি করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য ৫০০/১০০ লিটারের রিজার্ভার/ ট্যাংক সরবরাহ করা যেতে পারে, যা সুপেয় পানির অভাব মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
- ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন : প্রকল্পের সহায়তায় প্রতিটি সমিতির জন্য একটি করে ক্ষুদ্রাকার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন, যা সুপেয় পানির অভাব মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এছাড়া উপকারভোগীদের বাড়িতে পানি সরবরাহের জন্য প্রতি সমিতির জন্য ২টি করে ভ্যানগাড়ি সরবরাহ করা যেতে পারে।
- মিডওয়াইফ সেবা সরবরাহ : উপযুক্ত নারী সমবায়ীকে নার্সিং কলেজে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মিডওয়াইফ হিসেবে প্রস্তুত করা, যা প্রকল্প এলাকায় গর্ভকালীন সেবা এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমাতে ভূমিকা রাখবে, পাশাপাশি সুস্থ শিশু জন্মদানের সক্ষমতা তৈরি করবে।

২১ শতকের টেকসই উন্নয়নের বড় চ্যালেঞ্জ হলো জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তথা প্রান্তিক পর্যায়ে অবকাঠামো থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার উন্নয়নই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্বাচনপূর্বক সেখানে সমবায়ভিত্তিক কমিউনিটি রেজিলিয়েন্স গঠন ও অভিযোজন সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে এই উদ্যোগ সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১- ' দারিদ্র্য বিলোপ'; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮- 'শোভন কর্ম সুযোগ'; এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩- 'জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ' বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

আইরিন খানম
উপনিবন্ধক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-১)
সমবায় অধিদপ্তর।

দোহা কর্মপরিকল্পনা

সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন ভাবনা

আইনিন নাঈম ফিমা

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ব্যাপক উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো (LDCs) দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন মৌলিক সেবার অপ্রতুলতা এবং নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা এসকল দেশের টেকসই উন্নয়ন অর্জনের পথকে আরও সংকুচিত করছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার ন্যায় দোহা কর্মপরিকল্পনাও (DPoA) হলো একটি সমন্বিত রূপকল্প, কৌশল ও অঙ্গীকারের মেলবন্ধন, যা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নকে সহায়তা করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। ইস্তাম্বুল কর্মসূচি (IPoA) (২০১১-২০২০) সমাপ্ত হওয়ার পরে ১৭ মার্চ ২০২২ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতিসংঘ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বিষয়ক (LDC5 Conference)

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের তালিকা :

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	"ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ইনকাম জেনারেশন অ্যাক্টিভিটিজ থ্রো দ্যা রুরাল কো-অপারেটিভস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প।	বাস্তবায়িত
২	"সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণে এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি" প্রকল্প।	বাস্তবায়িত
৩	"গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন" প্রকল্প।	বাস্তবায়িত
৪	"সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ" প্রকল্প।	বাস্তবায়িত
৫	"দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ-সমাজিক উন্নয়ন" প্রকল্প।	বাস্তবায়িত
৬	"দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গজ্ঞাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ" প্রকল্প।	বাস্তবায়িত
৭	"উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" প্রকল্প।	বাস্তবায়িত
৮	"আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের আওতায় কম্পোনেন্ট হিসেবে "সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন" প্রকল্প	বাস্তবায়িত
৯	"দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প -১ম সংশোধিত" প্রকল্প	বাস্তবায়িত
১০	"সমবায় মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প-১ম সংশোধিত" প্রকল্প	চলমান
১১	"দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প -১ম সংশোধিত" প্রকল্প	চলমান
১২	"সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন" শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	চলমান

সম্মেলনে দোহা কর্মপরিকল্পনা (DPoA) (২০২২-২০৩১) গৃহীত হয়। দোহা কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (LDCs) ও তাদের উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যুগোপযোগী ও শক্তিশালী অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একইসাথে এই কর্মসূচি স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ কর্মপরিকল্পনার ছয়টি মৌলিক অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ হলো:

১. মানবসম্পদে বিনিয়োগ, দারিদ্র্য বিমোচন ও সক্ষমতা উন্নয়ন;
২. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের (STI) শক্তি কাজে লাগানো;
৩. সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে কাঠামোগত রূপান্তরকে সহায়তা করা;
৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক সমন্বয় বৃদ্ধি;
৫. জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা ও সহনশীলতা গড়ে তোলা; এবং
৬. টেকসই উত্তরণের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব জোরদার করা।

বাংলাদেশে দোহা কর্মসূচি (DPoA) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। যেখানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য ১ম মৌলিক অগ্রাধিকার ক্ষেত্রটিকে নির্দিষ্ট করা হলেও অন্যান্য মৌলিক অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহেও সমবায় অধিদপ্তরের অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের মূল কথা 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' অর্থাৎ উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মানব সম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। দক্ষ মানব সম্পদ দরিদ্রতা নির্মূলসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতে অবদান রাখতে সহায়ক হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে

জনমিতি লভ্যাংশের (Demographic Devidend) সুবর্ণ সময় অতিক্রম করছে। সফলভাবে এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে যুবসমাজকে আয়বর্ধক বিভিন্ন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করতে হবে।

সমবায় অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতি গঠনমূলক দপ্তর। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পল্লী নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, নিজস্ব সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন গঠন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা সম্পাদনের মধ্য দিয়ে সমবায়ভিত্তিক ভিশন ও মিশন বাস্তবায়ন করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে "টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন" এবং "সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় সৃষ্টি"। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের সাথে অধিকতর সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বর্তমানে সমবায় সমিতি নিবন্ধন, তদারকি,

পরিকল্পনা ও উন্নয়নসংক্রান্ত কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় অধিদপ্তরের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ নিম্নরূপ :

সক্ষমতা	দুর্বলতা	সম্ভাবনা	ঝুঁকি
১. সাংবিধানিক ভিত্তি : বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে মালিকানার দ্বিতীয় খাত সমবায়কে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ২. প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা : ১৯৯৬ সাল হতে সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে । ৩. সমবায় অধিদপ্তরের জনবল : প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয় রয়েছে। ৪. বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র : সমবায় সমিতি আইন-২০০১ (সংশোধিত ২০১৩) অনুযায়ী বর্তমানে ৩৫ ক্যাটাগরিতে সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে ফলে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে।	১. সমবায়ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুপস্থিতি : সরকারের কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে সমবায় অধিদপ্তরের কোনো কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা নেই। ২. প্রশিক্ষণের অভাব : মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের মাঝে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। ৩. সীমিত আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন : প্রকল্প গ্রহণের আওতা বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ডেইরি সেক্টর, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী এবং নারীদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ৪. আধুনিক প্রকল্প মনিটরিং ব্যবস্থার অভাব : বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী মনিটরিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল। ৫. গবেষণা কার্যক্রমের অভাব : সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রমের অভাব রয়েছে।	১. সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন : সমবায় বিধিমালা ২০০৪ এর ৭৭ বিধি (সংশোধিত ২০২০) অনুযায়ী পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনের টেকসই কৌশল হিসেবে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্র প্রসারিত। ২. সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন : সমবায় অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন এবং উদ্দেশ্যসমূহ আন্তর্জাতিক ও সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৩. আন্তঃদপ্তর সহযোগিতা : সরকারের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ বিদ্যমান। ৪. উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কাজের সুযোগ : বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর সাথে সমবায় অধিদপ্তরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য থাকায় একত্রে কর্মসম্পাদনের সুযোগ রয়েছে। ৫. প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্র : বাংলাদেশের সকল উপজেলায় সমবায় সংগঠন রয়েছে এবং সকল প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান।	১. সমবায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব : দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সমবায় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। অন্যদিকে, বিভিন্ন অনিয়মের কারণে সমবায় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। ২. যুগোপযোগী সমবায়ী নেতৃত্বের অভাব : অনেক ক্ষেত্রেই সমবায় সংগঠনগুলো নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং জাতীয় সমবায়সমূহের ব্যর্থতাসহ অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে সমবায় সমিতিগুলো টিকে থাকে না। ৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং : বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে জনবল স্বল্পতা রয়েছে। ৪. সীমিত পরিসরে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা : সমবায়ীদের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত জনবল নেই।

নিরীক্ষা ও অন্যান্য দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত, ২০২০) এর ৭৭নং বিধি অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতির সদস্যগণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

সমবায় অধিদপ্তর সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের জীবন মানোন্নয়নে নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রগুলোর মধ্য দিয়ে দোহা কর্মপরিকল্পনা (২০২২-২০৩১) এ সমবায় অধিদপ্তরের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

ক. সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে সমতলের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;

খ. সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন, যুব শ্রেণির স্বকর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

গ. গ্রামীণ উন্নয়নে গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন;

ঘ. পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও দুগ্ধ শিল্পের প্রসার, উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ;

ঙ. জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন।

সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্যগণ সাধারণত ১৮ বছর হতে তদূর্ধ্ব বছর বয়সী এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী ও তরুণদের অংশগ্রহণকে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ক. গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

দারিদ্র্য বিমোচন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র্য হ্রাসে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে আঞ্চলিক বিভাজন পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার জন্য এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণ এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল নেয়া হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি। গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় "বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি", "দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প" এবং "রাজশাহী বিভাগের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সমবায়ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃজন" প্রকল্প তিনটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

খ. নারী ও তরুণ উদ্যোক্তা

বাংলাদেশে বর্তমানে ৩৫ ক্যাটাগরিতে প্রায় ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৭১টি সমবায় সমিতি এবং ১ কোটি ২৫ লক্ষের অধিক সমবায়ী রয়েছে। এর মধ্যে দেশে প্রায় ২৭ হাজার মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রায় ১০ লক্ষ মহিলা সমবায়ী রয়েছে। যা মোট সমবায়ীর প্রায় ২৪%। সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে নারীদের আয়বর্ধনমূলক ও দক্ষতা উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং শক্তিশালী বাজার নেটওয়ার্ক তৈরির ব্যবস্থা করা হলে গ্রামীণ নারীরা স্বাবলম্বী হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে "সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন" প্রকল্প এবং "উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প- ২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে

ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (Demographic dividend) এর যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কর্মমুখী জনসংখ্যার এই ডিভিডেন্ডকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে সরকার ইতোমধ্যেই মানব সম্পদ তৈরির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করার জন্য তরুণদের অংশগ্রহণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য "সমবায়ভিত্তিক শিক্ষিত ও বেকার যুব উদ্যোক্তা ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃজন" প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সমবায়ের মাধ্যমে তরুণ উদ্যোক্তাদের আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক ট্রেডে দক্ষতা অর্জন ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

গ. গ্রামভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতি

এদেশের কৃষিখাত উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্যপীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। যার ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে- কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় অ্যাসোসিয়েশন ও প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক এ সকল কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন NATP, NATP Phase-2 প্রকল্পের আওতায় গঠিত সিআইজি সমবায় সমিতির সংখ্যা ২১,৮২১টি। এছাড়া বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক "সমবায়ভিত্তিক সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ঘ. কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরি উৎপাদক, উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের উৎপাদন থেকে শুরু করে বণ্টন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জনগণকে সুসংগঠিত করে যৌথ কৃষিখামার প্রচলনের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। ১৯৭৩ সালে দেশের দুধের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সমবায়ের ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা) প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করেছে একাধিক দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন প্রকল্প। বর্তমানে বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে তাতে সমবায়ী কৃষকদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বিধানে গ্রামীণ কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, মাংস ও ডেইরি উৎপাদকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ উদ্দ্যেশ্য পূরণে "সমবায়ভিত্তিক কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ ও ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা" প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ঙ. জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। এই পরিবর্তনে জনসংখ্যার যে অংশটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন, তারা হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। জলবায়ু পরিবর্তন ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর খাদ্য, পানি, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার অধিকার প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এবং সর্বোপরি মানসম্মত জীবনযাপনের অধিকার থেকে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠিত করে ঝুঁকি অভিযোজন (adaptation) নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত Local Government initiative on Climate Change (LoGIC) প্রকল্পের আওতায় ৯টি জেলার ২৯টি উপজেলায় সমবায় সমিতিসমূহ নিবন্ধন প্রদানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমবায় অধিদপ্তর কাজ করছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও সমবায়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজস্ব মূলধন ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে আবাসন খাত, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই প্রকল্প, ক্ষুদ্র ঋণ প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রায় ১১ লক্ষ সমবায়ীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যমান সমবায় সমিতিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দোহা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায়খাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র :

১. National Action Plan for Implementation of Doha Programme of Action for The Least Developed Countries for the Decade 2022-2031.2023. Economic Relations Division, Ministry of Finance. Government of the People's Republic of Bangladesh.
২. www.logicbd.org
৩. বার্ষিক প্রতিবেদন : ২০২৩-২০২৪, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

আইনিন নাঈম ফিমা
উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।

গুজরাটের গোয়ালা হতে কানের মঞ্চে

‘মন্থন’ উপমহাদেশের সমবায় বিপ্লবের এক কালজয়ী উপাখ্যান

উম্মে মরিয়ম

২২ মে, ২০২৪ ফ্রান্সের কান নগরীর বুথুয়ে থিয়েটার হল থেকে ভেসে আসছে গ্রামীণ নারীকণ্ঠের গান, “মারো গাও কাথাপারে, যাহা দুধ কি নাদিয়া বেহে ... মারো গাও আংনা ভুইল না” অর্থাৎ আমার গ্রাম কাথাপারে, সেখানে দুধের নদী বয়ে যায় আমার গ্রাম ঘর ভুলে যেও না। চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমানদের মুগ্ধ করে যাওয়া এই গান আবহমান গ্রামীণ সমবায়ের গল্পের কথা বলে যার সূত্রপাত ৪০ এর দশকে এই উপমহাদেশে সংঘটিত সমবায়ের কালজয়ী বিপ্লবের।

৭৭তম আন্তর্জাতিক কান চলচ্চিত্র উৎসব এর ক্লাসিক বিভাগে প্রদর্শিত হয় ৫০ বছর পূর্বে মুক্তি পাওয়া শ্যাম বেনেগাল এর মন্থন চলচ্চিত্রটি যার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে সমবায়ের আদর্শ, সমবায়ের গান, সমবায়ের গল্প।

এই চলচ্চিত্রটি ভারতের বিখ্যাত দুগ্ধ আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উপমহাদেশে সমবায়ের পথচলার গল্পকে।

মন্থন ছবির একটি দৃশ্য

বিশেষ করে হোয়াইট রেভেলুইশন তথা দুগ্ধ বিপ্লবকে। ভারতের শ্বেত বিপ্লবের প্রতিষ্ঠান আমুল এর মাধ্যমে পরিচালিত অপারেশন ফ্লাড এর পূর্বে গোটা ভারতে দুধের উৎপাদন ছিল ২২ মিলিয়ন টন যা ২০২৪ সনে এসে দাঁড়িয়েছে ২২১ মিলিয়ন টনে। বর্তমানে পৃথিবীর মোট দুগ্ধ উৎপাদনের প্রায় ২৩ শতাংশ ভারতের এবং এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত আছে ১৬ মিলিয়ন দুগ্ধ সমবায়ী। ভারতের শ্বেত বিপ্লবের জনক ভার্গিস কুরিয়েন এর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমুলের প্রতিষ্ঠা এবং দুগ্ধ ঘাটতি থেকে বিশ্বের অন্যতম দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে ভারতের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক গৌরবগাঁথা হচ্ছে এই চলচ্চিত্রটি।

গুজরাটের প্রত্যন্ত গ্রামের পটভূমিতে তৈরি চলচ্চিত্রটির সমবায়ের উপর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র না হলেও এর রয়েছে অনন্য স্বীকৃতি। এটি নির্মাণে প্রযোজক ছিলেন ভারতের পাঁচ লক্ষ সমবায়ী যারা গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের সদস্য। তারা প্রত্যেকে দুই রুপি প্রদান করেন এই চলচ্চিত্র নির্মাণে এবং এর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন স্বয়ং ভার্গিস কুরিয়েন ফলে সৃষ্টি হয় সমবায়ের সম্মিলিত প্রয়াসের অনন্য ইতিহাস। এছাড়াও কালজয়ী এই চলচ্চিত্রটি উপমহাদেশের সমবায়ীদের অর্থায়নে তৈরিকৃত প্রথম ক্রাউডফান্ডেড (Crowd-Funded) সিনেমা।

গল্পের মূল কুশিলব এখানে গ্রামের সাধারণ গোয়ালারা যারা তাদের ন্যায্য মুনাফা হতে বঞ্চিত, যাদের সামাজিক মর্যাদা নেই, আর্থিক স্বাধীনতা নেই। জাত, ধর্ম, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামীণ এই জনপদের জীবনে সমবায়ের আলোড়ন তুলতে আসেন তরুণ যুবা ড. রাও। ড. রাও বিশ্বাস করেন সমবায়ে শক্তি, সমবায়ে মুক্তি এই নীতিতে। তিনি এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে দেখান গ্রামীণ মহাজন কিভাবে দুধ বিক্রির লাভ থেকে গরিব গোয়ালাদের যুগের পর যুগ প্রতারিত করে যাচ্ছে। কিভাবে জাত পাতের নাম তুলে তাদেরকে সম-অধিকার হতে বঞ্চিত করে যাচ্ছে। কৃষকের শ্রম কিভাবে মহাজনের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একমাত্র সমবায়ই তাদের জীবনে মুক্তি নিয়ে আসতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে বঞ্চিত এই জনপদের ভাগ্যোন্নয়নে তখন ড. রাও এর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের সাধারণ নারী বিন্দু, ভোলা এবং অন্যরা যখন ন্যায্য দাবিতে সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে চায় তখন তাদের উপর শোষক শ্রেণির অত্যাচার নেমে আসে। কিন্তু ড. রাও এবং সাধারণ গ্রামবাসী এতে করে দমে যায় না। তাদের জাগরণের এই মন্থন সমগ্র উপমহাদেশে সমবায় আন্দোলনে জোয়ার এনে দেয়। এই চলচ্চিত্রের অন্যতম চরিত্র বিন্দু যেন উঠে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ভোলা চরিত্রটি গ্রামীণ কৃষকদের সংগ্রাম এবং স্বপ্নকে প্রতিফলিত করে। তাদের এ সংগ্রাম যেন সমবায়ের অন্তর্নিহিত শক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের ক্ষমতায়নের প্রতিচিত্র।

১৯৪৬ সালে উপমহাদেশে আমুল প্রতিষ্ঠার সময়ে যখন সবাই স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর তখন একদল গ্রামবাসী স্বপ্ন দেখে অর্থনৈতিক মুক্তির। মন্থনে যখন ড. রাওকে জিজ্ঞেস করা হয় সমবায় কেমন প্রতিষ্ঠান? এ তো শহরের কার্যকলাপ! আমরা তো দলিত! গ্রামীণ গরিব লোক এখানে কি আমাদের স্থান হবে? উত্তরে ড. রাও জানান এখানে সবার সমান অধিকার, এখানে জাত পাত, ধর্মের ভেদাভেদ নেই। এই সামাজিক আর অর্থনৈতিক আলোড়নের গল্প সবাইকে জানানোর জন্য এই চলচ্চিত্রটি তৈরি করা হয়। সমবায়ের যে মূলমন্ত্র তা ভেসে আসে বিন্দুর কণ্ঠে "আমরা চিরকাল অন্যের দয়া চাইবো না, আমরা নিজের ভাগ্য নিজেই গড়তে শিখবো।"

আপাত দৃষ্টিতে মন্থন একটি সাধারণ গ্রামীণ চলচ্চিত্র মনে হলেও এর পিছনের ইতিহাস মূলত একে করেছে অনুরূপ অন্যান্য চলচ্চিত্রটি হতে ব্যতিক্রম। বিশেষ করে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সমবায় আন্দোলনকে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমবায়কে অন্যান্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে এই চলচ্চিত্রটি। ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবের বুথুয়ে থিয়েটারে ক্লাসিক বিভাগে প্রদর্শনের পর সিনেমাটিকে দেওয়া হয় স্ট্যান্ডিং অভ্যেশন। উপমহাদেশে সমবায়ের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী হিসেবে প্রদান করা হয় গ্লোবাল সাউথ এর উন্নয়ন মডেল এর সম্মাননা।

গুজরাটের গ্রাম থেকে কানের জমকালো মঞ্চে - 'মন্থন'-এর এই যাত্রা শুধু একটি চলচ্চিত্রের গল্প নয়, এটি সমবায় আন্দোলনের জয়গাথা। ৫০ বছর পরও এই চলচ্চিত্র আমাদের শেখায় - ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই পারে সমাজ বদলাতে। ড. রাও এর ভাষায় "একটি দিয়াশলাইয়ে আলো জ্বালালে একটি ঘরে আলো হয়, কিন্তু সমষ্টির আলোয় আলোকিত হতে পারে সমগ্র জাতি!" সমবায়ের সেই আলো ছড়িয়ে যাক এ অঞ্চলের প্রতিটি ভাগ্যতাড়িত জনপদের অলিতে গলিতে।

উম্মে মরিয়ম
উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।

সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড

প্রকৃতি নির্ভর জীবিকার সফল সমবায় মডেল

সুন্দরবন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন, যা বিশ্ব ঐতিহ্য ও রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত। এ বন বাংলাদেশের প্রায় ৪০% বনভূমি জুড়ে বিস্তৃত এবং দেশের প্রায় ৫ লাখ উপকূলীয় মানুষ এ বনের সম্পদের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক মধু সংগ্রহ এ অঞ্চলের মানুষের একটি প্রধান পেশা।

প্রতিবছর প্রায় ২০০০ মৌয়াল সুন্দরবন থেকে প্রায় ২,৭০০ কুইন্টাল মধু ও ৭০০ কুইন্টাল মোম আহরণ করেন। প্রধানত খলসি, বাইন, কেওড়া প্রভৃতি ফুল থেকে সংগৃহীত এই মধু স্বাদ ও গুণে অনন্য।

এই মৌয়ালদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে শ্যামনগরের পাঁচটি গ্রামের ২০ জন মৌয়াল নিয়ে গঠিত হয় সুন্দরবন মৌয়াল শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড, যা বর্তমানে ৯০টি পরিবারের ১৯৩ জন সদস্যের একটি সক্রিয় সংগঠন।

মূল কার্যক্রম ও উদ্যোগ

- সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত মধু প্রক্রিয়াজাত ও মোড়কজাতকরণ

- “মৌয়াল মধু” নামে বাজারজাত
- মধু ক্যান্ডি, মিনি প্যাক, চকলেট ও মোম দিয়ে সাবান ও শিল্প সামগ্রী তৈরি
- কেওড়া ফল দিয়ে আচার উৎপাদন
- মহিলাদের ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান

সাফল্যের পেছনের গল্প

একসময় মৌয়ালরা মহাজনের দাদনের ফাঁদে পড়ে দরিদ্রতা থেকে মুক্ত হতে পারতেন না। মধু সংগ্রহের পূর্বেই ঋণ নিতে হতো এবং পরে নামমাত্র মূল্যে মধু বিক্রি করতে হতো। ২০১৬ সালে রজব আলীর নেতৃত্বে গঠিত সমবায় সমিতি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায়।

জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় (৳১.৭ কোটি) গড়ে ওঠে কারখানা, অফিস ভবন, মেশিনারিজ, মিনি ট্রাকসহ নানা স্থায়ী সম্পদ। এখন মৌয়ালরা দাদন ছাড়াই সমবায় থেকে ঋণ নিয়ে বন থেকে মধু সংগ্রহ করে এবং ন্যায্য মূল্যে সমিতিতে বিক্রি করেন।

অর্থনৈতিক প্রভাব

- বছরে ৪–৫ টন মধু সংগ্রহ (মূল্য প্রায় ২০–২২ লক্ষ টাকা)
- ৮০–৮৫ জন সরাসরি এবং ৩৫–৪০ জন পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানে যুক্ত
- ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে সরবরাহ এবং জাপানে রপ্তানির উদ্যোগ

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

সমবায়টি কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, সামাজিকভাবেও পরিবর্তন এনেছে। সদস্যদের সঞ্চয় বেড়েছে, মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। সরকার ও প্রশাসনের নজরও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার বলেছিলেন– ‘অন্ন যখন কাড়ে মহাজন, দালাল, তখন দরকার ঐক্য।’

সুন্দরবনের মৌয়ালরা সে ঐক্য গড়ে তুলেই প্রমাণ করেছে-সমবায়ই পারে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন ঘটাতে।

জেলা সমবায় কর্মকর্তা, শ্যামনগর, খুলনা।

লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণ দান সমবায় সমিতি লিঃ

এক দশকের অভিযাত্রায় সাফল্যের দৃষ্টান্ত

নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শাজাহানপুর উপজেলার বেতগাড়ী এলাকায় ২০ জন সদস্য মিলে একটি সমবায় সমিতি গঠন করে সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেয়। নিবন্ধন নং- ১৪৪ তারিখ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রি.। নিবন্ধন পরবর্তীতে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সমিতি পরিচালনা করায় সমিতিটি বর্তমানে একটি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং বগুড়া জেলার সমবায় অঙ্গনে নিজস্ব কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্থান করে নিয়েছে।

সদস্য সংখ্যা ও বিভিন্ন কর্মসূচি

নিবন্ধন কালে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০ জন বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৮৫ জন। ১১ বছরে সদস্য বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জন করেছে ঋণ কার্যক্রম, সামাজিক উন্নয়ন ও স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে।

কার্যক্রমের বর্ণনা

সদস্যদের সাধ্যমতো শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করা, চাহিদাভিত্তিক ঋণ বিতরণ, মৌসুমি ঋণদান, কৃষি

আবাদের জন্য ঋণদান, মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগি খামার , গরু ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ছোট দোকান প্রতিষ্ঠান এবং ছোট গণপরিবহন (ভ্যান, রিকশা) ক্রয় বা মেরামতের জন্য ঋণদান। অন্যান্যগুলোর মধ্যে হিজরাদের পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধীদের স্ব-নির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন। বিশেষ করে সেলাইয়ের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

বিগত বছরগুলোর কর্মকান্ড

সদস্যদের সাধ্যমতো শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করা, চাহিদাভিত্তিক ঋণ বিতরণ, মৌসুমি ঋণদান, কৃষি আবাদের জন্য ঋণদান, মৎস্য খামার, হাঁস-মুরগি খামার, গরু ছাগল পালন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ছোট দোকান প্রতিষ্ঠা এবং ছোট গণপরিবহন ক্রয় বা মেরামতের জন্য ঋণদান। অন্যান্যগুলোর মধ্যে হিজরাদের পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন। বিশেষ করে সেলাইয়ের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

কর্জ দাদন

সমিতি থেকে সদস্যদের মাঝে গাভি পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, সেলাই শিক্ষা ও ব্লক ও বাটিক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা খ্যাতে কর্জ দাদন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে ২৩,৯৬,০০০ টাকা কর্জ দাদন করা হয়েছে। কর্জ আদায় ২১,৪৮,১৪,৬০০ টাকা। সমিতি থেকে কর্জ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৬২টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। কর্জ দাদনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে অগ্নিশিখা হিসেবে কাজ করছে। কর্জ প্রদানের পাশাপাশি সদস্যদের উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

সমিতির সফলতা

সমিতির শুরু থেকেই সমবায় বিধি ও আদর্শের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। সদস্য বৃদ্ধি, শেয়ার সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের এবং স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমিতিটি সফল করা সম্ভব হয়েছে। সমবায় দিবস ২০১৮ তে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে স্থান পেয়েছে। ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ তে শ্রেষ্ঠ মডেল সমবায় হিসাবে পুরস্কার প্রাপ্ত এবং ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৩ তে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

কীভাবে সফল হলো

সমিতির শুরু থেকেই সমবায় বিধি ও আদেশের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। সদস্য বৃদ্ধি, শেয়ার সঞ্চয় বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের এবং স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সমিতিটি সফল করা সম্ভব হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা

প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, সেলাইয়ের বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। গরিব সদস্যদের মাঝে ঈদসামগ্রী চাল, আলু, পেয়াজ, ডাল, লবণ, সেমাই, চিনি, সয়াবিন তেল, গুঁড়া দুধ, সাদা সেমাই, লেবু এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা

উপজেলা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভা করা হয়। গত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য সংখ্যা ১৮৫ জনের মধ্যে ১৬৬ জন উপস্থিত ছিল। উক্ত উপস্থিতি সমিতির জবাবদিহিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণক।

উপসংহার

লিচুতলা মানব কল্যাণ সঞ্চয় ও ঋণ দান সমবায় সমিতি লিঃ এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। ভবিষ্যতে সমিতিটি উত্তরোত্তর সাফল্যের দিক এগিয়ে যাক।

জেলা সমবায় কর্মকর্তা, বগুড়া।

সমবায় কার্যক্রম

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ সমবায় অধিদপ্তরের স্টল উদ্বোধন করেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম।

জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, মাননীয় উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের স্টল পরিদর্শন করেন ।

বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি অধিদপ্তরের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ও সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সচিব অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উপ-সচিব জনাব স্বপন বোস বিগত ৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে পাইকগাছা উপজেলার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ষোলোআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ পরিদর্শন করেন। সমিতির সদস্য সংখ্যা পুরুষ ৯৪০ জন, মহিলা ১১৮ জন, মোট ১,০৫৮ জন।

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা বিগত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে নড়াইল জেলা সমবায় অফিস পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি নড়াইল জেলা সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ঘুরে দেখেন।

২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ এর আওতায় তথ্য অধিকার, ২০০৯ বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সমবায় অধিদপ্তরের তিতাস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণে জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), তথ্য কমিশন, ঢাকা, তথ্য অধিকার, ২০০৯ নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব, তথ্য আইনে আপিল নিষ্পত্তি ও অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি এবং তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে সমবায় অধিদপ্তরের ৩০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রতি সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকায় 'ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম (IDSDP) সিস্টেম' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে সমবায় সমিতির নিবন্ধন, অবসায়ন ও বাতিল কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১০ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মপরিকল্পনার আওতায় 'মাঠ পর্যায়ে অফিস ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪৭ জন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও সহকারী পরিদর্শক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর। প্রশিক্ষণে জাতীয় তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ, জিআরএস, সমবায় নিরীক্ষা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রস্তুতকরণ ও তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মপরিকল্পনার আওতায় 'মাঠ পর্যায়ে অফিস ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ৪৩ জন কর্মকর্তা এতে অংশ নেন। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম প্রশিক্ষণটি উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণে তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ, জিআরএস, সমবায় নিরীক্ষা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও তথ্য অধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমবায় অধিদপ্তর এবং মাঠপর্যায়ের ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে 'অকার্যকর সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: কার্যকরকরণ, অবসায়ন ও বাতিল' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম।

জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম, অতিরিক্ত নিবন্ধক, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক ছায়া সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর অফিস ও খামার পরিদর্শন।

SAMABAYA ● January-March 2025 ● Price Tk 25.00 ● Regd No. DA-41

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B,
Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 48111805 I Editor : Fahmida Akhter Lima